ফ্রাঁসোয়া সাগঁর এই প্রথম পুস্তকটি ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ, সাহিত্যিক সম্মান Grand Prix des Critique লাভ করেছে এবং ফরাসী সংস্করণে ৫ লক্ষ কপি, অনুদিত হয়ে আমেরিকাতে ২ লক্ষ কপি এবং ইংলণ্ডে ১ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়েছে।

কারণ? উত্তর খুবই স্পষ্ট। উপন্যাসের আশ্চর্যজনক বাস্তবতা এবং সত্যকথনের নির্ভীকতা, কামজ এবং মনস্তাত্ত্বিক—এক ব্যক্তি তার দুই বান্ধবী এবং সদ্য বিদ্যালয় প্রত্যাগতা মেয়ের কথা—পড়লে মনে হয় না ১৮ বছরের বালিকার লেখা, বরঞ্চ মনে হয় কোন মহিলার লেখা—যিনি অনেক বেশী চিন্তাশীল, লিখন ব্যাপারে সাতিশয় পটু, এবং নির্ভীক সত্যকথনে অনেক বেশী দুঃসাহসী।

বাংলা অনুবাদটিও হয়েছে আশ্চর্যরকম সুন্দর। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন "অনুবাদ মাত্রই কাশ্মীরী শালের মত; মূল নক্সার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর সব সৌন্দর্য উল্টোপিঠে ওৎরায় না।" আমাদের বিশ্বাস শ্রীমতী কল্পনা রায় এ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে "ওৎরায় এবং মাঝে মাঝে উল্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশী মূল্য ধরতে জানে।"

তৃষ্ণা

ফ্রাঁসোয়া সাগঁ

অনুবাদঃ কল্পনা রায়

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্সঃ কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সেন
আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দাম : তিন টাকা মাত্র।

প্রথম মুদ্রণ : ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৪
১৮ই বৈশাখ ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন : শ্রীভাস্করানন্দ রায়
ব্লক করেছেন : লাইন য়্যাণ্ড টোন

ছেপেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস,
২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বিদায়, তোমারে—হে বিষাদ !
স্বাগত, তোমারে—হে বিষাদ !
ধরার আদিতে তোমারি মূরতি,
প্রিয়ার আঁখিতে তোমারি আরতি,
শুধুই বিষাদ নহ গো !

অভাজন আহা ! ম্লান হাসি হেসে
তোমারে ত্যাজিতে চাহে গো !

স্বাগত ! বিষাদ ! স্বাগত !
প্রিয়তনু ঘিরি
প্রেমের জোয়ার
আপনি উছলি উঠিয়া—
অঙ্গবিহীন ব্যর্থ সে হিয়া
কাঁদিছে রহিয়া রহিয়া !
সুমধুর তুমি—হে বিষাদ।

P. Eluard

Bonjour Tristesse

প্রথম খণ্ড

১

কি এক বিচিত্র অনুভূতি আমাকে ঘিরে রেখেছে সদাসর্বদা। প্রকাশ তার গম্ভীর, অপরূপ! কি বল্‌ব তাকে? বিষাদ! কল্পনা করতে রোমাঞ্চ লাগে, কিন্তু লজ্জা লাগে তার নগ্ন আত্মম্ভরিতায়। অবসাদ, অনুতাপ, কখনও বা অনুশোচনা—এরা আমার চেনা, কিন্তু এ এক নতুন অনুভূতি, সূক্ষ্ম, কোমল তার আবরণ, কিন্তু দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য। আমাকে সে জড়াচ্ছে ক্রমশঃই, সম্মোহিত করছে, দুর্বল করছে, আমার চেনা জগৎ থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে।

গ্রীষ্মকাল। সতেরো বছরের রং আমার দেহে মনে। তখন আমার জগৎটা ছিল গণ্ডীভূত, বাবা, তাঁর প্রণয়িনী এল্‌সা ও আমাকে নিয়ে। বুঝিয়ে বলি, নইলে গলদটুকু যাবেই থেকে। বাবার বয়স তখন চল্লিশ, তারও পনের বছর আগে, মাকে হারিয়েছি আমরা। স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি ছিল তাঁর অসীম। এর দু'বছর আগে কন্‌ভেন্ট থেকে প্যারিসে ফিরে আবিষ্কার করলাম, বাবা আর একা নেই। বান্ধবী জুটেছে তাঁর। কিন্তু প্রতি

ছয় মাস অন্তর যে তাঁর রুচি পরিবর্তন হয়, এ তথ্য আবিষ্কার করতে সময় লাগ্‌ল। ক্রমে তাঁর সম্মোহিনী-শক্তি আমার নতুন পাওয়া স্বাধীনতা, আমার চঞ্চল প্রকৃতি সব মিলিয়ে তাঁর জীবন-ধারার সঙ্গে আমায় খাপ খাইয়ে নিল। বাবার প্রকৃতি ছিল অধীর, চঞ্চল, কুতূহলী ; ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল প্রখর ; মেয়েদের হৃদয় জয় করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর অসীম স্নেহ মমতা উদারতা সহজেই আমার মন জয় করল। তাঁর মত হাসি-খুশী প্রাণখোলা মানুষ সহজে চোখে পড়ে না।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন— 'এল্‌সা' আমাদের সঙ্গে থাকলে আমার কোন আপত্তি হবে কিনা। সেই সময়ে তাঁর দুর্বলতার প্রতিমূর্তি এল্‌সা ছিল লম্বা গড়নের মেয়ে, মাথাভরা ছিল তার লাল চুলের রাশ, সরল, সহজ স্নেহপ্রবণ বাস্তবমুখী ছিল তার মন। যে কোন ষ্টুডিও বা ক্যাম্প সাঁজেলিজের আড্ডাখানায় এ ধরনের মেয়ে সদাসর্বদা চোখে পড়ে। আমি তখনই বাবার প্রস্তাবে রাজী হ'লাম, কারণ বাবার জীবনে নারীসঙ্গের চাহিদা যে কতখানি, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। আর এও জানতাম যে, এল্‌সা আমাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। তাছাড়া বাইরে যাওয়া নিয়ে আমাদের এমন একটা আগ্রহ ছিল যে, এর মাঝে কোন আপত্তি আন্‌তে আমার মন সায় দিল না। ভূমধ্য সাগরের উপকূলে প্রকাণ্ড এক সাদা বাংলো বাবা ভাড়া নিলেন। গত

বসন্তের সমাগম থেকেই আমরা এই বাড়িটীর আশায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। পাইন বন দিয়ে ঢাকা, বড় রাস্তা থেকে সরানো, সমুদ্রের কিনারে উঁচু টিলার ওপর ছিল আমাদের সেই শান্ত সুন্দর বাংলোটি। খাল পর্যন্ত টানা একটা মেঠোপথ সোজা গড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানটাতে মরচে রং ধরা পাথরের গায়ে ঢেউগুলো মরছিল মাথাখুঁড়ে।

প্রথম ক'টা দিন ছিল রোদ ঝল্‌মলে। ঘন্টার পর ঘন্টা বালুতটে শুয়ে থাকতাম আমরা, ক্রমে আমাদের গায়ের রং পাকা সোনার মত হয়ে এল। কেবল এল্‌সার সর্বাঙ্গ প্রথমে লাল হয়ে ঝল্‌সে গেল, পরে খোসা ছাড়ানোর মত চামড়া উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বেচারী অসম্ভব যন্ত্রণায় কাতর হ'ল। ডন্‌ জুয়ানের পক্ষে অস্বস্তিকর ভুঁড়ির পরিধিটুকু হ্রাস করার জন্য বাবা উঠে পড়ে জটিল জটিল সব ব্যায়াম শুরু করে দিলেন। ভোর থেকেই আমি গিয়ে জলে ঝাঁপ দিতাম। ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ জলে আমার শরীর থেকে প্যারিসের ধূলোকাদা ধুয়ে ফেল্‌তে আমারও চেষ্টার ক্রটি ছিল না। বালির ওপর দেহ দিতাম এলিয়ে। হাতের মুঠিতে ভ'রে নিতাম বালি, তারপর মুঠিটাকে আল্‌গা করে আঙ্গুলের ফাঁকে মুক্তি দিতাম তাদের। কোমল পিঙ্গল স্রোতের ধারায় গড়িয়ে যেত তারা। মনে মনে কল্পনা করতাম সময়টাও এদেরই মত যায় পিছলে গড়িয়ে। অলস কল্পনা তবু ভাল লাগ্‌ত এদের প্রশ্রয় দিতে, কারণ ছিল সেই বিশেষ ঋতুটা।

ছ'দিনের দিন সিরিলের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ছোট্ট একটি নৌকা করে কূলে কূলে ভেসে বেড়াচ্ছিল—হঠাৎই আমাদের সেই খালটার সামনে এসে ওর নৌকাটি গেল উল্টে। আমি তো দারুণ উৎসাহে ওকে সাহায্য করতে লেগে গেলাম। এই সূত্রে আমাদের পরিচয়টাও উঠ্‌ল জমে। সে তার নাম বল্ল; সে যে আইনের ছাত্র একথাটাও জানিয়ে দিল। বল্ল, কাছেই আমাদের মত এক বাংলোয় তার মাকে নিয়ে এসে উঠেছে। ওর মুখে চোখে এমন একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল যে প্রথম দৃষ্টিতেই আমার ভাল লেগে গেল। মনে হ'ল এ লোকটির ওপর নিশ্চিন্ত মনে ভরসা করা চলে। সাধারণতঃ কলেজের ছাত্রদের আমি এড়িয়ে চলতাম। আমার চোখে তাদের কেমন যেন অসভ্য, অহঙ্কারী, নাটুকে বলে মনে হ'ত। ওদের একঘেঁয়ে জীবনের জন্য ওরাই যে দায়ী এ বিষয়েও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সব কারণেই তরুণদের আমি বিশেষ বরদাস্ত করতে পারতাম না। বরং বাবার চল্লিশোত্তর বন্ধুদের ভাল লাগ্‌ত বেশী। তাঁরা আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলতেন। বাবারই মত, মাঝে মাঝে কেউ বা প্রেমিকের মত মধুর ব্যবহার করতেন। কিন্তু সিরিলের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন, তার মত বলিষ্ঠ, সুন্দর চেহারা, মানুষের বিশ্বাস আপনিই কেড়ে নেয়। আমার বাবার অসুন্দরের প্রতি বীতরাগের ফলেই আমাদের চারপাশে মূর্খদের আড্ডা জমে উঠ্‌ত। তাঁর মত প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা না হলেও ঐ একই ভাবের থেকে

আমারও কেমন যেন অসুন্দর মানুষের সামনে অস্বস্তিবোধ হ'ত। সৌন্দর্যহীনতা সম্বন্ধে তাদের অচেতনতাকে আমি অসভ্যতারই নিদর্শন বলে ধরে নিতাম। কারণ মানুষের মন ভোলানো ছাড়া আমাদের জীবনের আর কী যে উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে, তা আমার জানা নেই। জীবনীশক্তি, স্বত্ববোধ, অথবা নিজেদের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার অব্যক্ত কোন চাহিদা থেকেই অন্যকে আকর্ষণ করার এই ইচ্ছার উদ্ভব হয়েছে কিনা বল্‌তে পারি না।

যাবার আগে সিরিল আমাকে নৌকা চালাতে শেখাবে বলে গেল। তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম যে, যাবার সময়ে আদৌ কোন কথা বলিনি আর সেইজন্য বাবার কোন অস্বস্তিও আমার চোখে পড়েনি। যথা-নিয়মে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বারান্দায় পাতা চেয়ারগুলোয় গা এলিয়ে দিলাম। সাধারণতঃ জুলাই মাস নাগাদ এদিকে উল্কা খসে বেশী। তবু তারাভরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছিলাম হয়ত এক্ষুণি একটা তারা আকাশের গা' থেকে ছিট্‌কে পড়বে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে কানে তালা লাগে। গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্নায় মাতাল করা রাতে হাজার হাজার ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে এখানে। শুনেছিলাম পা দুটো ঘসে ঘসে ওরা ওরকম শব্দ করে। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতাম যে গরমের দিনে বেড়ালগুলোর ম্যাও ম্যাও ডাকের মত এরাও গলা থেকেই ঐ সুর বের করে।

আরামে চোখ বুজলাম, কিন্তু জামার ভেতর বালিকণাগুলোর দৌরাত্ম্যে ঘুম এল না। হঠাৎ বাবা কেমন যেন কুণ্ঠিতভাবে কেশে উঠ্‌লেন ; বল্লেন—"আমাদের এখানে একজন অতিথি আস্‌ছেন।" মনটা দারুণ দমে গেল। এত সুখ বুঝি আর সইল না। আর কারুর কথায় এল্‌সার আবার দারুণ উৎসাহ, তড়বড়িয়ে প্রশ্ন করল—"কে সে ?" বাবার উত্তর শুনলাম—"আন্‌ লারসেন।" চম্‌কে উঠ্‌লাম "আন"কে যে বাবা এখানে নেমন্তন্ন করতে পারেন এ ধারণাই আমার মাথায় আসেনি। আন্‌ আমার মায়ের বন্ধু হলেও বাবার সঙ্গে যোগাযোগ তার খুবই কম ছিল। বছর দুই আগে আমি যখন কন্‌ভেণ্ট থেকে ফিরি, আর বাবা আমাকে নিয়ে হিম্‌সিম্‌ খাচ্ছিলেন—সে সময়ে তিনি আন্‌কে ডেকে আমার ভার নিতে বল্লেন। সপ্তাহ্‌খানেকের মধ্যে সে আমাকে কেতাদুরস্ত করে ছাড়ল। সাজ-পোষাক পরতে শেখাল, আরও বহু বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে দিল। আমার মনে হ'ত পৃথিবীতে অমন মানুষ বুঝি আর হয়না। সত্যিই ওর প্রতি দারুণ আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। সে কিন্তু সুচতুর নাবিকের মত তারই এক পরিচিত যুবকের প্রতি আমার এই উচ্ছ্বাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সাজসজ্জা, আমার প্রথম প্রেম, সবেরই হাতেখড়ি তার কাছে। চল্লিশ বছর বয়সে অত সুন্দর মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। অপূর্ব মুখখানি, আত্মসচেতন, শান্ত, দাম্ভিক। তার এই দাম্ভিকতা নিয়ে অনেকে অনেক সময়ে অভিযোগ করত। অমন দরদী

হৃদয় নিয়ে সে জনসমুদ্রের উপকূলে একাই দিন কাটাত। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অন্তরের পবিত্রতার এক দুর্ভেদ্য আবরণ সর্বদাই তাকে ঘিরে রাখত। বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তার কোন প্রেমিক জোটেনি। অবশ্য ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিবেকসম্পন্ন লোকদেরই সে বন্ধু হিসেবে বেছে নিত। বাবার সৌন্দর্য-ভরা তথা-আমোদপ্রিয়তার জন্য আমাদের বেশীর ভাগ সঙ্গী ছিল ফুর্তিবাজ, হাল্কা প্রকৃতির। আমার ধারণা ছিল, আমাদের এই হাল্কা, আমোদপ্রিয় স্বভাবকে ও সবরকম উগ্রতার মতই ঘৃণা করত। ব্যবসা সূত্রে, হয়ত বা মায়ের স্মৃতি হিসেবে ওর সঙ্গে আমাদের ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল। তার কর্মক্ষেত্র মেয়েদের সজ্জাভরণের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ, বাবার ছিল বিজ্ঞাপন বিভাগ। কাজেই মাঝে মাঝে ব্যবসায়িক নিমন্ত্রণাদিতে ওঁদের সাক্ষাৎ হ'ত। এর সঙ্গে জড়িত ছিল আমার নিজস্ব তাগিদ, কারণ ওর সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা ভয় থাকলেও প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতাম ওকে। সেই জন্যেই আমার নৈতিক জীবন গড়ে উঠার পক্ষে এমন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তার আবির্ভাবের আশঙ্কায় আমি চিন্তিত হ'লাম।

আনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে এল্সা শুতে গেল। বাবার সঙ্গে একাই রইলাম আমি। সিঁড়ির ওপর একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছ ঘেসে

বসলাম। সাম্‌নে ঝুঁকে বাবা আমার কাঁধে হাত রাখলেন। ভারী মিষ্টি করে বল্লেন—"মামনি! তুমি এত রোগা কেন? ঠিক একটা জংলী বিল্লির মত চেহারা হয়েছে তোমার। আমার মেয়ে হবে দিব্যি সুন্দর গোলগাল, নীল চোখ আর মাথাভরা ফুরফুরে চুল....."আমি ঝাঁকিয়ে উঠলাম—"ওসব ফালতু কথা রাখ। কেন তুমি অ্যান্‌কে এখানে ডাকলে বলত? আর সেই বা কেন রাজী হয়ে গেল বাপু।"

"হয়ত তোমার বুড়ো বাপকে দেখতে সাধ হয়েছে।...বলাতো যায় না।"

"আহা, তোমার মত লোকেদের ও দু'চোখে দেখতে পারে না। কি রকম বুদ্ধিমতী, রাশভারী মেয়ে জানতো? এখন এল্‌সার কি ব্যবস্থা করবে শুনি? ওরা দু'জনে কি বিষয় নিয়েই বা কথাবার্তা চালাতে পারে ভেবে দেখেছ কি? আমার তো মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

বাবা স্বীকার করলেন—"সত্যিই তো, একথা তো আগে মনে হয়নি। কি কাণ্ড হ'ল বলত? সেসিল! তবে কি আবার প্যারিসেই ফিরে যাব?" অপ্রস্তুত হেসে আমার ঘাড়টায় হাত ঘসে দিলেন। আমি ফিরে চাইলাম। ওঁর কালো চোখ দুটো চক্‌চক্ করছিল, চোখের পাশে ছোট ছোট বলি রেখার খাঁজ। ঠোঁট দুটো ঈষৎ উপরে ফেরান ছিল—ঠিক্ যেন একটি নিরীহ হরিণ শাবক। বরাবরের মত এবারেও তাঁর নিজের পাতা ফাঁদে

আট্‌কে পড়তে দেখে হাসি চাপ্‌তে পারলাম না। বাবা সোহাগ করে বল্লেন—"ওরে আমার দুষ্কর্মের ক্ষুদে পার্টনার। তুই না থাক্‌লে আমার কি দুর্দশাই না হ'ত।" আন্তরিকতায় কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এসেছে টের পেলাম। মাঝরাত পর্যন্ত আমরা প্রেম ও তার জটিলতা নিয়ে গবেষণা চালালাম। বাবার মতে আমার অনেক ধারণাই অমূলক। প্রেমের গভীরতা, নিষ্ঠা, এসব তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, আমার ধারণাগুলো একেবারে যুক্তিহীন,প্রাণহীন। আর যে কোন লোকের মুখে এ ধরনের কথা শুন্‌লে আমি মর্মাহত হ'তাম। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এত কথার পরেও তাঁর প্রেম বা নিষ্ঠার কোন অভাব ছিল না, কারণ ক্ষণস্থায়ী হিসাবে ধরে নিতেন বলেই এই অনুভূতিগুলি তাঁর কাছে আপনা থেকেই ধরা দিত। প্রেমের এই স্বল্পায়ু, উচ্ছ্বসিত ক্ষণভঙ্গুর রূপ আমায় মুগ্ধ করত, কারণ গভীরভাবে ভালবাসার বয়স আমার তখনও হয়নি। অবশ্য প্রেমের গোপন অভিসার, চুম্বন অথবা সবশেষের চরম সুখের পরম অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না তখনও।

২

"আন্" এসে পৌছতে তখনও সপ্তাহখানেক দেরী। মাঝের এই কটা দিন অবারিত মুক্তির জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম। কোথাও যেন এতটুকু ফাঁক না থেকে যায়। আমাদের বাংলোটা পুরো ছ'মাসের মত ভাড়া নেওয়া ছিল। তবু আমি জানতাম যে, আন্ এসে পড়লে একেবারে গা এলিয়ে থাকা চল্‌বেনা! আন্ সব ব্যাপারের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খলা, সব কথার একটা যুক্তি এনে ফেল্‌তো, যেটা আমার বা বাবার কারুরই ধাতে সইত না। সুরুচি আর পারিপাট্যের একটা ধারা তার ছিল। কথা-বার্তার মাঝখানে উঠে পড়া, ওর মুখের ভাবভঙ্গী, কিম্বা আঘাত পেয়ে চুপ করে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা তার পরিচয় পেতাম। এক দিক দিয়ে ওর সব ধরনধারণ যেমন চমৎকার লাগত, অন্য দিক দিয়ে আবার বড় ক্লান্তিকর মনে হ'ত। পদে পদে ওর ত্রুটিহীন আচরণে শেষ অবধি আত্মগ্লানি বোধ করতাম।

ও'র আসবার দিন বাবা আর এল্‌সা ও'কে ফ্রেজু স্টেশনে আন্‌তে যাবেন ঠিক হ'ল। আমি কোনমতেই ওঁদের সঙ্গে যেতে

রাজী হ'লাম না। ক্ষুব্ধ হয়ে বাবা বাগানের সব গ্লাডিওলি কেটে নিয়ে তোড়া বেঁধে তাই দিয়ে আন্‌কে অভ্যর্থনা করতে ছুটলেন। আমি শুধু সাবধান করে দিলাম এল্‌সা যেন আগে-ভাগে তোড়াটা নিয়ে এগিয়ে না যায়। ওরা চলে যেতে সমুদ্রের দিকে রওনা হলাম। বেলা তখন তিনটের কাছে। প্রচণ্ড গরম। বালির ওপর পড়ে আছি, একটু যেন তন্দ্রা এসেছে, শুন্‌লাম সিরিল আমার নাম ধরে ডাক্‌ছে। গরমে ঝলসানো সাদাটে আকাশ চোখে পড়ল। জবাব না দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলাম কারণ ঠিক ঐ মুহূর্তে কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে ছিল না। গ্রীষ্মের রুদ্র তেজ আমায় বালির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিল। হাত ছুটো ভারী যেন সীসের তৈরী, মুখের ভেতরটা শুক্‌নো খট্‌খটে। সে বল্ল—"বেঁচে আছ তবে! দূর থেকে মনে হচ্ছিল জলে ভেসে আসা কোন মরা মানুষ বুঝি।" মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম। কাঁধের কাছে ওর হাতের ছোঁয়া লেগে হঠাৎ যেন বুকের ভেতর তাণ্ডব নৃত্য শুরু হ'ল। গত সপ্তাহে আমার নৌ-চালনার কল্যাণে বহুবার আমরা জলে পড়ে দুজনে জড়াজড়ি করে হাবুডুবু খেয়েছি, কিন্তু কোন বিশেষ উত্তেজনা বোধ করিনি। আকাশের এই ভৈরব মূর্তি, আমার আচ্ছন্নভাব, আর তার ঐ হঠাৎ ছোঁয়া—সব মিলিয়ে আমার সব বাঁধন দিল আলগা করে। মাথাটা আস্তে ফেরালাম ওর দিকে। ভাল করে এতক্ষণে যেন চিন্‌তে পারছি ওকে। বয়সের পক্ষে ও যেন বড় বেশী ধীর,

স্থির, শান্ত, সংযত। ঠিক এই জন্যেই আমার পারিবারিক ব্যবস্থা ও'কে এত করে আঘাত দিত। আমার ওপর মায়া করেই হোক্ বা ভয়েই হোক্, আমায় কখনও এ নিয়ে কোন কথা বলেনি, তবে বাবাকে যে ভাবে লক্ষ্য করত, তাই থেকে আমি ধরেছিলাম ওর মনের কথা। এ অবস্থা যে আমার পক্ষেও অসহ্য একথা ও'র কাছে স্বীকার করলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হ'ত। কিন্তু আমার তো কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল না। সত্যি বলতে সেই মুহূর্তে আমার হৃদ্‌যন্ত্রের অসংযত ব্যবহারটাই আমার পক্ষে বেশী কষ্টকর হচ্ছিল। ও' আমার মুখের ওপর ঝুঁকে এলো। গত ক'দিনের কথা মনে হ'ল, ও'র সান্নিধ্যে যে শান্তি, যে তৃপ্তি পেয়েছি সে কথা মনে করে ও'র নরম পরিপূর্ণ দুটি ঠোঁটের সুখস্পর্শের লোভ দমন করার ইচ্ছে হ'ল। বল্লাম—"সিরিল কি আনন্দেই না কাট্‌লো আমাদের দিনগুলো। আল্‌তো নরম দুটি ঠোঁটের ছোঁয়া লাগল আমার ঠোঁটে। আমি একবার আকাশের দিকে চোখ মেলে চাইলাম। তারপর বন্ধ চোখের পাতার নীচে নতুন আলোর ঝল্‌সানিতে ধাঁধা লাগ্‌ল। প্রথম প্রেমের মাতাল করা, অবশ করা উত্তেজনাটুকু অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করলাম। হঠাৎ একটা হর্ণের শব্দে অপরাধী মন নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম দু'জনে। সিরিলকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে আমি বাড়ির দিকে ছুট্‌লাম। গাড়ীটা এত শিগ্‌গির এসে পড়বে ভাবিনি। আনের ট্রেণ আদৌ কি করে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছল!

কিন্তু ঐ তো আন্, নিজের গাড়ীর দরজা খুলে নেবে আস্‌ছে। আন্ বল্ল—"এ যেন রূপকথার দেশের ঘুমন্ত পুরীর মত নীরব নিস্তব্ধ। সেসিল্—কি সুন্দর তামাটে হয়ে এসেছে তোমার গায়ের রং—ভারী মিষ্টি লাগ্‌ছে তোমায়।"

উত্তরে বল্লাম—"তোমায় দেখে সত্যিই খুশী হয়েছি। সোজা প্যারিস্ থেকে আস্‌ছ তো।"

"হ্যাঁ, নিজেই গাড়ীটা হাঁকিয়ে চলে আস্‌তে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু আপাততঃ চাই বিশ্রাম।"

ওর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে এসে জানালাটা খুলে দিলাম—হয়ত বা সিরিলের নৌকাটি দেখা যাবে—এই আশায়। কিন্তু নৌকাটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আন্ ধপ্ করে বিছানার ওপর বসে পড়ল। ওর চোখের কোলে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা নজরে এল।

আন্ বল্ল—"কি চমৎকার বাংলোটা তোমাদের! বাড়ির কর্তামশায়কে দেখ্‌ছি না তো!"

"বাবা তো এল্‌সাকে নিয়ে তোমায় স্টেশন থেকে আন্‌তে গেলেন।" আমি সুট্‌কেশটা চেয়ারে রাখতে পেছন ফিরে ছিলাম, ওর দিকে চোখ পড়তে অবাক হয়ে গেলাম। মুহূর্তে কী যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কোন রকমে জিজ্ঞেস্ করল—"কী ব্যাপার? এল্‌সা ম্যাকেনবারাকে এখানেও টেনে এনেছে নাকি?"

আমার মুখে কোন উত্তর জোগাল না। বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল, কিন্তু বুঝতে কষ্ট হ'লনা যে আমার নয়, আমার কথাগুলোর পেছনে যে খবরটুকু লুকোন আছে তাকেই দেখ্ছে ও। শেষে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বল্ল—"আসার আগে তোমাদের প্রস্তুত হতে সময় দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলাম—" দম্ দেওয়া কলের মত আমি জিজ্ঞেস করলাম—"এখন তবে কি হবে?"

"কিসের কি হবে?" যেন কিছুই হয়নি এই ভাবে আগের কথাগুলো সম্পূর্ণ মুছে ফেলে পাল্টা প্রশ্ন করল আমায়। আমি বোকার মত হাত কচ্লাতে কচ্লাতে বল্লাম—"এখন আর কি? —তোমাকে পেলাম। তুমি জাননা কি আনন্দ হচ্ছে তোমায় দেখে। নাও ধড়াচূড়া খোল, আরাম কর। আমি নীচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তেষ্টা পেয়েছে? ড্রিংসের অভাব নেই এখানে।" আবোল্ তাবোল বকতে বকতে আমি নীচে পালিয়ে বাঁচলাম। আমার মনের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল। কেন? কিসের জন্যে ওর মুখখানা অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, গলা কাঁপ্ল, উৎকণ্ঠার ছায়া পড়ল চোখে। আরাম চেয়ারটায় বসে চোখ বুজে আমি ভাব্তে চেষ্টা করলাম। আনের বিভিন্ন ভাবভঙ্গী মনে আসতে লাগ্ল—কখনও বা

উদাসীন-গম্ভীর, কখনও বা স্নেহ-মধুর, কখনও বা ব্যঙ্গ-কঠোর, আবার কখনও বা সহজ-প্রভুত্ব। হারমানা যে ওর পক্ষেও অসম্ভব নয় একথা ভেবে একাধারে রাগ ও দুঃখ হ'ল। এও কি সম্ভব, আন্‌-ও কি আমার বাবার প্রেমে পড়েছে? তাঁকে ভালবাসা ক ওর পক্ষেও অসম্ভব নয়?

বাবা যে মোটেই সে ধরনের মানুষই নন্। তিনি যে অত্যন্ত চপল, দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারণা করতেও দ্বিধা করেন না। হয়ত আমারই মনের ভুল। হয়ত এ শুধু ক্লান্তি কিম্বা বিতৃষ্ণার ছায়া। ঘণ্টাখানেক মিথ্যে ভাবলাম বসে বসে।

পাঁচটা নাগাদ বাবা আর এল্‌সা ফিরলেন। তাঁকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে আমার আবার সন্দেহ হ'ল, তবে কি আন্ সত্যি বাবাকে ভালবাসে। মাথাটা ঈষৎ পেছনে হেলিয়ে হন্ হন্ করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন,—ঠোঁটে মিষ্টি হাসিটুকু লেগে ছিল। আন্ বাবার প্রেমে পড়বে এ আর আশ্চর্য কথা কি? যে কেউ ওর প্রেমে পড়তে পারে। চেঁচিয়ে বল্লেন—"আন্‌কে পেলাম না, গাড়ী থেকে পড়ে যায়নি আশাকরি।"

আমি জবাব দিলাম—"ওর নিজের গাড়ীতে এসেছে ওপরে আছে।" "সত্যি? অসম্ভব! নে, নে, এই তোড়াটা ওকে দিয়ে আয়তো।" ওপর থেকে আনের গলা পেলাম—"আমার জন্যে ফুল এনেছ বুঝি? বাঃ কি সুন্দর।" ইতিমধ্যে রাস্তার

পোষাকটা ছেড়ে নিয়েছে। শান্ত, স্নিগ্ধ হাসিমুখে সিঁড়ি বেয়ে নেবে এল। ভেবে দেখলাম গাড়ীর শব্দ শোনার পরই সে নেবে এসেছে ; আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে আগেই নেবে আস্‌তো। অবশ্য এক হিসেবে ভালই হ'ল—কারণ ও নির্ঘাৎ আমার পরীক্ষার খবর জিজ্ঞেস করত—এদিকে আমি তো ফেল মেরে বসে আছি।

বাবা দৌড়ে গিয়ে ওর হাতে চুমু খেলেন—বল্লেন—প্ল্যাটফরমে এই তোড়াটা ধরে নাগাড় পৌনে এক ঘণ্টা তোমার আশায় বোকার মত দাড়িয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ তুমি এলে! "এল্‌সার সঙ্গে আলাপ আছে তো?" ভদ্রতায় গলে গিয়ে আন্ জবাব দিল—"নিশ্চয়ই দেখেছি কোথাও। আমায় কি সুন্দর ঘরখানা দিয়েছ! রেমঁদ আমায় আসতে বলে কি উপকারই না করলে! আমি একেবারে মরে যাচ্ছিলাম সেখানে।"

বাবা খুসীতে ডগ্‌মগ্ করতে লাগলেন। ওঁকে দেখে মনে হ'ল, দিব্যি যেন সব ঠিক ঠিক চলছে। এক মুখে কথা বলছেন—বোতলের ছিপি খুলছেন—মহা ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমার কিন্তু কেবলই সিরিলের মুখখানা মনে পড়তে লাগ্‌ল। আনের মতো এম্‌নি চাপা আবেশ আর বিদ্রোহের ভাব মেশানো সে মুখ। বাবা যেমনটি ধরে নিয়েছিলেন তেম্‌নি নিশ্চিন্ত আরামে বাকী ছুটিটা কাট্‌বে কিনা ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না।

প্রথম দিনের ডিনারটা ভালই জম্‌ল। বাবা আর আন্‌ নিজেদের পরিচিত গুটিকয়েক বন্ধু বান্ধবদের আলোচনায় মেতে উঠলেন। আমার বেশ লাগছিল। হঠাৎ আন্‌ বাবার ব্যবসায়ের পার্টনারটিকে গণ্ডমূর্খ বলে বস্‌ল। লোকটি দারুণ মদখোর বটে, কিন্তু মানুষ হিসেবে মন্দ ছিলনা। আমি, আর বাবা অনেক সন্ধ্যে ওকে নিয়ে ফুর্তি করে কাটিয়েছি। আমি তাই প্রতিবাদ করলাম—"লোম্বার্ট, ভারী মজার মানুষ দারুণ জমাতে পারে কিন্তু!"

আন্‌ বল্ল—"তুমি নিজেই স্বীকার করবে লোকটা প্রচণ্ড মদ খায়—সেটা একটা অপরাধ তো বটেই, তাছাড়া ওর ঠাট্টা-গুলো—"

আমি বল্লাম—"খুব যে একটা উঁচুদরের বুদ্ধিমান লোক সে কথা বল্‌ছি না—"

আমায় যেন পিঠ চাপ্‌ড়ে থামিয়ে দিল—"বুদ্ধির দর বলে যেটা তুমি ভাবছ সেটা শুধু মনের বিকাশ।" ও'র কথাটা আমার ভাল লাগল—আমি আনকে বল্লাম যে, ওর যুক্তিগুলো আমি ডায়েরীতে টুকে রাখব। বাবা হেসে উঠ্‌লেন—"যাক তবে তুমি ক্ষেপে যাওনি বল।" আন্‌তো আর আমায় আঘাত দিতে কথাগুলো বলেনি। ওর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। ও'র যুক্তিগুলোয় বিদ্বেষের জ্বালা ছিলনা। সেইজন্যই বোধহয় বেশী করে মনে থাকত।

সকলের চোখের ওপর দিয়ে এলসা যে 'নির্লজ্জের মত বাবার শোবার ঘরে ঢুকে গেল, এ যেন আনের চোখেই পড়ল না। আমার জন্যে নিজের মনের মত ডিজাইন করে একটা সয়েটার বুনে এনেছিল—কিন্তু ধন্যবাদ দিতে গেলে দারুণ আপত্তি করে। 'ধন্যবাদ' কথাটা ও' মোটে বরদাস্ত করতে পারত না, আমিও বিশেষ ভদ্রতার ধার ধারতাম না, কাজেই আমার দিক থেকে বেঁচেই গেলাম।

ও'র কাছে বিদায় নিয়ে শুতে যাবার সময়ে বল্ল—"এল্‌সাকে দেখে বেশ ভাল মেয়ে বলেই তো মনে হ'ল।" গম্ভীরভাবে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর একটু আগেকার মুখের ভাব আমার মনে আছে কিনা, সেটা যেন যাচিয়ে নিচ্ছে। বুঝলাম—আমি যেন সেকথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই এই চায় ও আমার ব্যবহারে। আমি আমতা আমতা করে বল্লাম—"হ্যাঁ, তা তো বটেই ভারী নরম মন ও'র।" আন্ হেসে ফেল্ল। দারুণ উত্তেজিত মন নিয়ে শুতে গেলাম। আমি সিরিলের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। হয়ত ঠিক এই সময়েই সিরিল এল্‌সারই মত কোন এক সুন্দরীর কণ্ঠলগ্না হয়ে "কানসে"র নাচ ঘরে মেতে আছে।

সমুদ্রের সান্নিধ্য আর তার অনর্গল "নৃত্যের তালে তালে" তরঙ্গোচ্ছ্বাসের বর্ণনা দিতে ভুল করেছি আমি। আমাদের ইস্কুলের মাঠে চারটে লেবু গাছ আর তাদের বুনো গন্ধ; তিন

বছর আগে আমায় সেখান থেকে আনতে গিয়ে স্টেশনে আমার পাশে দাড়িয়ে বাবার সেই হাসিটুকু, আমার দুই বিনুনি আর কালো বিশ্রি স্কুলের পোষাক দেখে তাঁর সেই অপ্রস্তুত ভাব, এসব কিছুই বলিনি আগে। তারপর ট্রেনের মধ্যে আমার মুখে তাঁর চোখ, তাঁর ঠোঁট আবিষ্কার করে দারুণ একটা খেলবার জিনিষ পেয়েছেন মনে করে খুশী হয়ে উঠা। আমি তো তখনও দেখিনি কিছুই।

আমায় তিনি প্যারিস্,—তার বিলাসিতা, তার প্রমোদমত্ত জীবন—সবকিছু দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সে সময়ে আমার যাবতীয় আনন্দের গোড়ায় ছিল টাকা ঢালার প্রশ্ন—খুব বেশী অশ্বশক্তির মোটরে চড়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়ানো, নিত্য-নতুন পোষাক, গ্রামাফোন-রেকর্ড, বই, ফুল ইত্যাদি কেনা, এই সব সখ ছিল আমার। অবশ্য এখনও আমার এ ধরনের সখ আছে। আমি এগুলো আমার প্রাপ্য হিসেবেই ধরে নিই। বরং আমার কল্পনা-বিলাসের অপূর্ব রহস্যময় মুহূর্তগুলো বাদ দিয়েও আমি বাঁচতে পারি, কিন্তু এই সব পার্থিব বিলাসিতার অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমোদ-প্রিয়তাই আমার চরিত্রের একমাত্র অবিচল ধারা। বিদ্যার অভাবই কি এর কারণ? ইস্কুলে পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন-তথ্যের যোগান দেওয়া হয়। প্যারিসে পড়ার সময় কোথায়? ক্লাস শেষে বন্ধুরা নিয়ে যেত সিনেমায়। ওরা অবাক্ হ'ত অভিনেতাদের নাম পর্যন্ত

আমার জানা নেই দেখে। ওদের সঙ্গে রোদ ঝল্‌মলে হোটেলের বারান্দায় বসে আড্ডা দিতাম। মদ খাওয়ার আনন্দ, প্রেমাবেগে মুগ্ধ দুটি চোখের চাউনি, নির্জনে নিরালায় দু'জনে কাছাকাছি বসে থাকা, হেটে হেটে বাড়ি ফিরে আসা, তারপর বাড়ির দরজায় এসে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়া—এত সব সুখের অভিজ্ঞতায় নিজেকে দিলাম ভাসিয়ে। স্মৃতির পাতায় নামের বোঝা টেনে আনার ব্যর্থ প্রয়াস করে লাভ নেই।—জিন্, হিউবার্ট, জেকস্…প্রত্যেক তরুণীর জীবনে এদের অভিজ্ঞতার রূপ প্রায় একই ধরনের। সন্ধ্যে বেলাটা রীতিমত বড়দের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটত আমার। বাবার সঙ্গে পার্টিতে যেতাম। এই সব জায়গায় সাধারণতঃ পাঁচ রকমের লোকের ভিড় হয়। ঠিক্ যে খাপ খেতাম তা নয় তবু ভাল লাগত। বিশেষ করে আমার বয়সের জন্যেই সবাই আমায় নিয়ে মজা পেতো। সন্ধ্যের পর বাবা আমায় বাড়িতে নাবিয়ে দিয়ে তাঁর বান্ধবীকে পৌঁছতে যেতেন। অবশ্য এর পর তাঁর ফিরে আসার শব্দ কোন দিনই পেতাম না। প্রেমের বড়াই করে বেড়ানো তাঁর স্বভাব ছিল না, কিন্তু আমার কাছে লুকোচুরি করার চেষ্টাও তিনি করতেন না। সকালে চায়ের টেবিলে প্রায়ই কোন বান্ধবীর উপস্থিতি, কিম্বা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাস নিয়ে বাবা আজগুবি গল্প আবিষ্কার করে আমায় ভোলাতে চেষ্টা করতেন না। তাছাড়া এই জাতীয় অতিথিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক

খুঁজে বের করতে আমায় আদৌ বেগ পেতে হ'ত না। সেই জন্যেই বোধহয় আমার চোখে ধুলো দিয়ে; তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাসের মূলে কুঠরাঘাত না করে এরকম খোলাখুলি ব্যবহার করতেন। এর ফলে ঐ কচি বয়সে কাঁচা অভিজ্ঞতায় প্রেমের আনন্দময় রূপটি আমার চোখে হারিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র দেহজ প্রবৃত্তি হয়ে ধরা পড়েছিল। নিজের মনের মধ্যে বার বার 'ওস্কার ওয়াইল্ডে'র কথাগুলো আবৃত্তি করতাম—"বর্তমান জগতের একমাত্র মূলমন্ত্রের নাম দুষ্কৃতি।" হয়ত নিজের জীবনে অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যেই এই ধরনের ভাব আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল। মনে হ'ত এই মন্ত্রকে ভিত্তি করে আমার জীবনকে আমি গড়ে তুলতে পারব। সুখ, দুঃখ, জীবনের ভাঙ্গা-গড়া, দৈনন্দিন হাসি-কান্না সব ভুলতে বস্‌লাম। পাপের ভারে বিকৃত নীতিবিগর্হিত জীবনই আমার আদর্শ হয়ে দাঁড়াল।

৩

পরদিন সকালে রবিরশ্মির একটা ফালি চুরি করে আমার ঘরে ঢুকে বিছানাটা দিল গরম করে আর সেই সঙ্গে আমার বিচিত্র স্বপ্নজাল দিল ছিন্নভিন্ন করে।

ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি, দারুণ তাপ থেকে মুখখানা আড়াল করার আশায় হাত তুললাম কিন্তু কোন লাভ হ'ল না। ঘড়িতে তখন দশটা বাজে। রাত-পাজামা না ছেড়েই আমি বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, দেখি খবরকাগজ হাতে আন্ বসে আছে। হাল্কা প্রসাধনের ছাপ তার মুখে। বুঝলাম, এ তার চিরদিনের অভ্যাস। আমার দিকে বিশেষ নজর দিল না দেখে আমি এক পেয়ালা কফি আর একটা কমলা লেবু নিয়ে সিঁড়িটার উপর বসে পড়লাম। সকালটা ছিল অপূর্ব সুন্দর। একবার করে কমলার রস মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে, এক ঢোক করে কফি খাচ্ছিলাম। তপনদেব আমার মাথায় গালে তাঁর তপ্ত পরশ বুলিয়ে দিচ্ছেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জলে গিয়ে ঝাঁপ দেব—হঠাৎ আনের গলা শুনে চম্‌কে উঠলাম—"সেসিল্—খাবে না কিছু?"

"আমি সকালে কফি বা চা ছাড়া বিশেষ কিছু খাই না।"

"আরও অন্ততঃ ছ'পাউণ্ড ওজন বাড়লে তোমায় মানুষের মত দেখাবে। তোব্‌ড়ানো গাল, বুকের পাঁজরগুলো পর্যন্ত

শোনা যায়—একি অবস্থা তোমার? যাও ভেতর থেকে মাখন এনে খাও।" ওকে আমার খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করছিলাম, আর ও আমাকে শরীর রক্ষার পক্ষে আহারের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল,—এমন সময় দামী একখানা রেশমী ড্রেসিং গাউন পরে পিতৃদেব রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'লেন। বল্লেন—"অহো! কি অপরূপ দৃশ্য। দুটি তরুণী রবির রশ্মি উপভোগকালে রুটি মাখনের গবেষণায় মত্ত।"

আন্ খুশীতে ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ল—"একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। তরুণী মাত্র একটিই এখানে উপস্থিত। আমার বয়সটা তোমার চেয়ে বিশেষ কম নয় রেমঁদ।"

বাবা নীচু হয়ে ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভারী মিষ্টি করে বল্লেন—"বরাবর একইরকম স্পষ্টবাদী রয়ে গেলে আন্।" এই আশাতীত সোহাগে আন্ অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নীচু করল। আমি অলক্ষ্যে স্থান ত্যাগ করলাম। সিঁড়িতে এল্‌সার সঙ্গে দেখা হ'ল। চোখ দুটো ফুলোফুলো, ঠোঁটটা ফ্যাকাশে, এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠেছে বোঝা গেল। প্রচণ্ড গরমে ও'র সারা শরীর ঝল্‌সে লাল হয়ে গেছে। আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল যে, নিঁখুত, পরিপাটী সাজে আন্ আগেই নীচে নেবে গেছে। ওকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছে হ'ল যে, আন্ সযত্নে সূর্যকিরণ থেকে তামাটে রং সংগ্রহ করবে নিজ দেহে; এল্‌সার মত বিশ্রি রকম পুড়িয়ে ফেল্‌বে

না নিজেকে। এল্‌সার বয়সটা ছিল উনত্রিশ, আনের চেয়ে তেরো বছরের ছোট এবং এইটুকুই ছিল ওর ভরসা।

স্নানের পোষাকটা টেনে নিয়ে খালের দিকে ছুটলাম। এর মধ্যেই সেখানে সিরিলকে তার নৌকায় বসে থাক্‌তে দেখে অবাক্ হ'লাম। গম্ভীরভাবে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে নৌকার দিকে নিয়ে চল্ল। সিরিল বল্ল,—"আমার কালকের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।" ওর থম্‌থমে মুখ দেখে আমি জবাব দিলাম—"সে দোষ তো আমারই।" নৌকোটা জলে ঠেলে দিতে দিতে আবার বল্ল—"আমার নিজের ব্যবহারে যে কি পরিমাণ আত্মগ্লানি বোধ করছি,—কি বল্‌ব।" আমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম—"কিন্তু তার তো কোন কারণ নেই।"

"আমি সত্যিই অনুতপ্ত।"—ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি নৌকায় উঠে পড়েছি। নৌকার পাড়ে হাত দিয়ে ও হাটুজলে দাঁড়িয়েছিল, যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাব দেখে বুঝলাম যে মনটা হাল্কা করতে না পারলে ও আমার সঙ্গে আসবে না। পঁচিশ বছর বয়সেও যে সে নিজেকে হীনপ্রবৃত্তির দাস মনে করে দুঃখ পেতে পারে এ দেখে হাসি এল।

সে বল্ল—"হেসো না। জান, কাল বিকেলে আমি তোমায় নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারতাম। আমার হাত থেকে তুমি

নিজেকে বাঁচাতে কি করে? তোমার বাবা আর ঐ স্ত্রীলোকটির কাণ্ডকারখানা দেখছ না? তুমি জাননা আমি কত নীচ, জঘন্য।” ওর কথা আমার আদৌ অসঙ্গত মনে হ’ল না। গভীর প্রেমময় মুখখানিতে কোমল অন্তঃকরণের ছায়া দেখলাম। মনে হ’ল ও’র প্রেমে জীবন ধন্য করি। দু’হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। ও’র প্রশস্ত বক্ষ আমার নিজের দেহের তুলনায় কঠিন মনে হ’ল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লাম—“সিরিল! ভারী মিষ্টি তুমি! আদরের ভাইটি আমার।”

অস্ফুট আর্তনাদ করে ও আমায় জড়িয়ে ধরল এবং সযত্নে নৌকা থেকে নাবিয়ে নিল। নিজের বুকের কাছে তুলে নিল, মাথাটা ও’র কাঁধে হেলিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে আমি ওর প্রেমে নিজেকে হারালাম। সকালের আলোয় ওর শরীর থেকে যেন সোনালী আভা ঝরে পড়ছিল। আমারই মত সুকোমল মনে হ’ল ও’কে। আমায় ওর হাতে নির্ভয়ে ছেড়ে দেওয়া চলে এবিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁটের পরশ পেয়ে দুজনেই অপূর্ব আনন্দের অনুভূতিতে থরথর করে কেঁপে উঠ্‌লাম। কোন অনুতাপ বা লজ্জার অবকাশ ছিল না, দুজনে যেন দুজনের মন খুঁজে পেলাম।—কেবলমাত্র মাঝে মাঝে আনন্দের অস্ফুট অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই রইল না আর। শেষে আমি ও’র বাহুর বন্ধন মুক্ত করে নৌকোটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, সেটা ততক্ষণে অনেকটা সরে গেছে। ঠাণ্ডা,

সবুজ জলে মুখ ডুবিয়ে উত্তেজনা শান্ত করলাম। একটা আদিম শিহরণ আমার সারা দেহ চঞ্চল করে দিল।

সাড়ে এগারটায় সিরিল চলে যাবার পর দুই মহিলার সঙ্গে মেঠোপথ বেয়ে বাবা এলেন। দুহাতে দুজনকে ধরে—যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি—এইভাবে অপূর্ব মহিমায় এগিয়ে আসছিলেন। রিভিয়েরার উপযোগী কোট ছিল আনের গায়ে। আমাদের সকলের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে সেটাকে খুলে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। ছোট্ট একটুখানি কোমর, সুন্দর দুখানি পা এবং সর্বদা যত্নের ফলে নিখুঁত দেহাবরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি বাবার পছন্দের তারিফ করে ইশারা করলাম, কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! তাঁর দিক থেকে কোন সায় পেলাম না, উল্টে তিনি চোখ বন্ধ করে শুলেন। বেচারী এল্‌সা তখন প্রচণ্ড উৎসাহে সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করতে ব্যস্ত। মনে মনে বুঝলাম বাবার কাছে ও'র মেয়াদ আর বড় জোর এক সপ্তাহ।

আন্ আমার দিকে ফিরল—"সেসিল, এখানে এত ভোরে ওঠ কেন? প্যারিসে তো দুপুর পর্যন্ত ঘুমোতে!"

আমি জবাব দিলাম—"আমি যে তখন পড়াশোনা করতাম, তাইতেই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।" আর সকলের মত অন্যের মন রক্ষা করে ও হাস্‌ত না কখনও, খুশী হলে হাস্‌ত। "পরীক্ষার কি হল?" ওর প্রশ্নের উত্তরে দিব্যি নিশ্চিন্তভাবেই জবাব দিলাম—"হবে আবার কি? ফেল করেছি।" "কিন্তু সে বল্লে তো চল্‌বে

না, অক্টোবরে পাশ তোমায় করতেই হবে।" বাবা বল্লেন—"দরকার কি? আমার তো কোন কালে কোন ডিপ্লোমা জোটেনি কপালে—তাও তো দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।" আন্ বাবাকে মনে করিয়ে দিল—"তোমার জীবন আরম্ভ করার সময়ে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলে, মনে আছে?"

সদম্ভে বাবা জবাব দিলেন—"আমার মেয়েকে যত্ন করার লোকের অভাব হবে না।" এল্‌সা হাস্‌তে গিয়েও আমাদের মুখ দেখে থেমে গেল। আন্ চোখ বুজে গম্ভীরভাবে এই আলোচনায় ছেদ টান্‌লো যেন—"সেসিল্, ছুটিতে তোমায় পড়তেই হবে।" আমি ভয়ে ভয়ে বাবার দিকে তাকালাম—সেদিক থেকে কোন ভরসা পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু বাবা যেন ওর কথাই সমর্থন করে অসহায়ভাবে হাসলেন। আমার চোখের সামনে ভবিষ্যতের একটা ভয়াবহ দৃশ্য ফুটে উঠল,—আমি যেন 'বার্গস' খুলে বসে আছি আর সিরিল আমার জন্যে খালটায় নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই কল্পনায় মনটা বিদ্রোহ করে উঠ্‌ল। আমি আনের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে গড়িয়ে গড়িয়ে ওর কাছে গেলাম। আন্ চোখ মেলে চাইল। আমি মুখখানায় যথাসম্ভব করুণ, ক্লান্ত ভাব এনে অনুনয় করলাম,—"আন্ এই গরমের মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই আমায় পড়তে বসাবে না। এই বিশ্রামটুকু আমার যে কত দরকার—কি বলব।"

"এই গরমের মধ্যেই তোমায় পড়তে হবে। প্রথম ক'টা

দিন তুমি গোলমাল করবে জানি—কিন্তু আখেরে পরীক্ষায় পাশ করবে।" আমি গোমড়া মুখে জবাব দিলাম—"কতগুলো কাজ সকলকে জোর করে করান যায় না।" অপরূপ মহিমায় মৃদু হেসে চুপ করে রইল—আমি দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এলাম। রিভিয়েরার সর্বত্র নানারকম উৎসবের খবর এল্‌সা বাবাকে শোনাচ্ছিল—কিন্তু তিনি ওর কথা শুনছিলেন না। ওঁরা তিনজনে একটি ত্রিভুজের আকারে শুয়েছিলেন—তারই মাথা থেকে বাবা আনের পাশ ফেরানো মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাবার এই চাউনির অর্থ আমার অতি পরিচিত। বালির ওপর বাবার হাতের মুঠি ধীরে ধীরে একবার খুলছিল, পরক্ষণে বন্ধ হচ্ছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিলাম। ছুটির অনাবিল আনন্দে যে ভাটা পড়তে চলেছে, এই দুঃখে মনটা ভারী হয়ে রইল। হঠাৎ জলের নীচে একটা গোলাপী আর নীলে মেশানো ঝিনুক আমার চোখে পড়ল। আমি ডুব দিয়ে ওটাকে উদ্ধার করে সারা সকাল হাতের মধ্যে নিয়ে ঘুরলাম। মনে হ'ল ওটা আমার কাছে যেন আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে। আমি যত্ন করে ওটাকে রেখে দেব স্থির করলাম। অবাক্ হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে আজও সেটা আমার কাছেই আছে। অথচ সবকিছু হারানোই আমার স্বভাব। আজও সেই সুন্দর গোলাপী ঝিনুকটা আমার হাতেই আছে এবং অতীতকে মনের মাঝে জাগিয়ে তুলে চোখের জলের বান ডেকে আনছে। '

৪

পরবর্তী দিনগুলোয় এল্‌সার প্রতি আনের ব্যবহারে যেন মধুবৃষ্টি হতে লাগল। এল্‌সার কথাবার্তায় যে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাওয়া যেত, তার উত্তরে আন্ তার স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপ করে একবারও ও'কে অপদস্থ করেনি। আমি অবাক্ হয়ে শুধু আনের সহ্যশক্তি দেখে দিনে দিনে বেশী করে ওর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। অথচ একবারও ও'র তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির কথা কল্পনাও করে দেখিনি। আনের রূঢ়তায় বাবা হয়ত সহজেই ওর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়তেন, কিন্তু আনের মিষ্টি ব্যবহার তাঁকে এতদূর মুগ্ধ করল যে আনকে খুশী করার জন্যে তিনি সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকতেন। আন্‌কে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টায় তিনি এই কৃতজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করলেন। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে আনের মতামত গ্রহণ করে, আমার দায়িত্ব আংশিকভাবে তার হাতে তুলে দিয়ে ওকে দিয়ে যেন আমার মায়ের শূন্য স্থান পুরনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর ভেতর আনের প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণ প্রকাশ পেত, কারণ, ও'ই একমাত্র রমণী যার অঙ্গস্পর্শের জন্য লালায়িত থাকা সত্ত্বেও তাকে তিনি এ

যাবৎ আয়ত্ত করতে পারেন নি। সিরিলের দৃষ্টিতে এম্‌নি এক জ্বালার আভাস পেয়ে অবধি আমার মন দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোলায়িত হচ্ছিল,—'ধরা দেব', না—'সরে আস্‌ব!' এ বিষয়ে আনের তুলনায় আমার বিচক্ষণতার অভাব ছিল। তার ধীর, গম্ভীর ভাব,—বাবার প্রতি তার বন্ধুর মত আচরণ দেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। এখন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, আমি প্রথম দিন বোধহয় ওকে ভুল বুঝেছিলাম। তার এই সহজ সরল ব্যবহারে বাবা যে তার প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হচ্ছেন এ ধারণা আমার মাথায় আসেনি। তাছাড়া ও মাঝে মাঝে হঠাৎই এমন চুপ করে যেতো, যে এল্‌সার অবিশ্রাম বাক্যস্রোতের পাশে যেন আলোছায়ার ব্যবধান সৃষ্টি হ'ত। হায় এল্‌সা! সে বেচারী কোনরকম সন্দেহই করেনি, সেইজন্য শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও আগের মতই প্রাণখোলা হাসিখুশী ছিল।

শেষে একদিন, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় কিছু অনুমান করে। দুপুরে খাওয়ার আগে আমি দেখলাম ও' যেন বাবার কানে কানে কি বল্ল। মনে হ'ল প্রথমে বাবা যেন কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে সম্মতি জানালেন। কফিটা শেষ করে এল্‌সা উঠে পড়ল এবং দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ সুনিপুণা অভিনেত্রীর মত ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্‌ করল—"রেমঁদ,—আস্‌ছ তো?" ফরাসী মনহারিণীর দশ বৎসরের শিক্ষা বিফল হ'ল না। বাবা লজ্জারক্ত

মুখে উঠে দাঁড়ালেন এবং দিবানিদ্রার উপকারিতা সম্বন্ধে অস্পষ্ট মন্তব্য করতে করতে এল্‌সার অনুগমন করলেন। আন্‌ এতটুকু বিচলিত হ'ল না। আঙ্গুলের ফাঁকে সিগ্রেট্‌টা মিথ্যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার কিছু বলা দরকার মনে হ'ল। বল্লাম —"লোকে বলে গ্রীষ্মকালে দুপুরে ঘুমোন উচিত, আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়।" আন্‌ ধম্‌কে উঠ্‌ল—"যথেষ্ট হয়েছে, থাম।"

ওর গলার স্বরে কিছুই ধরতে পারলাম না বরং আমার কথাটা ওর কানে খুবই বিশ্রী লেগেছে বোঝা গেল। কিন্তু ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে কষ্ট হ'লনা, কত কষ্টে ও নিজেকে শান্ত করে রেখেছে। হয়ত ঠিক ঐ মুহূর্তে এল্‌সাকে ও সর্বান্তঃ করণে হিংসা করছিল। ও'কে কি করে সান্ত্বনা দেব এই ভেবে যখন কূল পাচ্ছিনা এমন সময়ে হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর কল্পনা মাথায় এল। হৃদয়-হীনতার প্রতি আমার মোহ চিরন্তন। নির্দয়তার মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই, নিজের প্রতি গর্ব আসে মনে। আমি লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—"এল্‌সার ঐ রকম পোড়া চামড়া নিয়ে ওদের বিশ্রামটা নিশ্চয়ই সুখভোগ্য হবে না।" আন্‌ ক্ষেপে উঠ্‌ল—"এ ধরনের মন্তব্যে আমার অরুচি আছে। তোমার বয়সে এ শুধু নির্বুদ্ধিতা নয়, অসহ্য।" প্রচণ্ড রাগ হ'ল,—জবাব দিলাম—"তুমি জান, আমি সম্পূর্ণ ঠাট্টা করছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁ'রা পরস্পরের সান্নিধ্য যথেষ্ট

উপভোগ করছেন।” আন্ আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেরাল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাইলাম। সে তখন চোখ বুঁজে শান্ত, ধীর স্বরে বলতে শুরু করল—“প্রেম সম্বন্ধে তোমার ধারণা আদিম, অমার্জিত। কেবলমাত্র কতগুলো বিক্ষিপ্ত শারীরিক উত্তেজনার সমষ্টিকে প্রেম বলেনা।”

আমি প্রত্যেকবার প্রেমে পড়বার সময়ে নতুন করে এই জিনিষটা অনুভব করেছি। হয়ত কোন মুখ, কোন অঙ্গভঙ্গী, কখনও বা চুম্বন সারা দেহে আলোড়ন তুলেছে—যদিও তার যুক্তি-সঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাইনি কখনও। আন্ বলে চলেছে—“প্রেমের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীর্ঘস্থায়ী স্নেহবন্ধন, মধুর সম্পর্ক, হয়ত বা কোন বিশেষ অভাব—কিন্তু তুমি কি বুঝবে এসব?” এক লহমায় আমার দিক থেকে মনটা টেনে নিয়ে খবরের কাগজে নিবিষ্ট করল। আমার মধ্যে কোমলতার অভাব আছে জেনে আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন না হয়ে আন্ যদি রাগ করত, তাহলেও ছিল ভাল। তবু আমার মনে হ'ল ও'র ধারণা ভুল নয়—আমি তো সত্যিই পশুর মত শুধুমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হই, বাইরের লোকেরা তাদের খুশীমত আমায় চালিয়ে নিয়ে যায়; আমি যে অত্যন্ত দুর্বল হাল্কা চরিত্রের মেয়ে! অতি দুঃখে নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মালো। আমি কোন কালেই আত্মসমালোচনা করে দেখিনি। গরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে আনের কথাগুলো ভেবে দেখলাম—“প্রেমের গতি ভিন্ন, প্রেম

জীবনের একটা অনিবার্য প্রয়োজন।” আমি কি কোনদিন তেমন করে কাউকে চেয়েছি?

পরের এক পক্ষ কালের কথা ভুলে গেছি প্রায়—কারণ সেই সময়ে আমি স্বেচ্ছায় আমাদের উচ্ছল জীবনস্রোতে কোন বাধা না-মানার পণ নিয়েছিলাম। কিন্তু ছুটির বাকী সময়টুকু ভুলিনি, কারণ ঐ সময়ে আমি পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।

প্রথম পর্যায়ে তিনটি আনন্দোজ্জ্বল সপ্তাহের ঠিক কোন্ মুহূর্তে বাবা আনের মুখের দিকে স্পষ্ট চোখ মেলে চাইলেন—মনে নেই। বোধহয় যেদিন হাসিঠাট্টার ছলে ওর নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য ওকে তিরস্কার করেন, সেই দিন কিম্বা হয়ত—যেদিন গম্ভীরভাবে এল্‌সার অজ্ঞতার সঙ্গে ওর সূক্ষ্ম বুদ্ধির তুলনা করেন সেইদিন! আমি বোকার মত এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এদের পরিচয় পনের বছরের; প্রেমে পড়তে হলে আগেই পড়তে পারতেন। একথাও ভেবেছিলাম যে প্রেমে যদি পড়েনই, বাবা ব্যাপারটাকে তিন মাসের বেশী গড়াতে দেবেন না, এবং স্মৃতিমাত্র সম্বল করে, হয়ত বা আহত হৃদয়ে আন্ দূরে সরে যাবে। তবু বরাবর জানতাম যে আন্‌কে অত সহজে ত্যাগ করা অসম্ভব!

এছাড়া সিরিল ছিল আমার সমস্ত মন জুড়ে। সন্ধ্যেবেলা আমরা দুজনে সেণ্ট ট্রপেজে চলে যেতাম। সেখানে বিভিন্ন

নাচঘরে মিষ্টি সুরের স্রোতে নাচের তালে গা ভাসিয়ে দিতাম। সেই সময়ে মনে হ'ত আমরা পরস্পরের প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছি। কিন্তু পরদিন সকাল পর্যন্ত তার রেশ থাকত না। দিনের বেলা আমরা নৌকা চালাতাম। মাঝে মাঝে বাবাও সঙ্গে থাক্‌তেন। উনি সিরিলকে পছন্দই করতেন। বিশেষ করে সিরিল যেদিন স্বেচ্ছায় বাবাকে সাঁতারে জিতিয়ে দিল— সেদিন থেকে ও'র প্রতি বাবার প্রীতি বেড়ে গেল। বাবা ওকে— "বৎস" বলে ডাক্‌তে শুরু করলেন—সিরিল জবাব দিত— "আজ্ঞা করুন।"

আমরা একদিন সিরিলদের বাড়ি চায়ের নেমন্তন্ন খেতে গেলাম। ওর মা দিব্যি হাসিখুশী মানুষটি—সংসারে বিধবা মা হয়ে থাকার যে কি যন্ত্রণা সে কথা বলে আর শেষ করতে পারেন না। বাবা যথেষ্ট সমবেদনা দেখাবার চেষ্টা করলেন, মনে মনে বিব্রত হয়ে ইশারায় আনের সাহায্য ভিক্ষা করলেন, আর অনর্গল ভদ্রমহিলার প্রশংসা করে গেলেন। বেচারী বাবা— ভদ্রতা রাখতে অনেকটা সময় বাজে খরচ করলেন। আন্ মিষ্টি হেসে সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। পরে সে মন্তব্য করল—"বেশ মানুষটি।" আমি এ জাতীয় মহিলাদের সম্বন্ধে যা' তা' বলছি শুনে বাবা আর আন্ দুজনেই হেসে উঠলেন। আমিও ক্ষেপে গেলাম।—

বল্লাম—"তোমরা বুঝতে পারছনা ওঁর আত্মগরিমা মাত্রা

ছাড়িয়ে যায়। উনি সংসারে সব দায়িত্ব পালন করেছেন এই গরবে মাটিতে পা পড়ছে না, আর—"

আন্ জবাব দিল—"কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। উনি যে যথার্থ স্ত্রীর কর্তব্য, মায়ের কর্তব্য পালন করছেন—এর মধ্যে তো কোন সন্দেহ নেই।"

আমি বল্লাম—"কিন্তু তার বেশী কিছু করেছেন কি, যেমন রক্ষিতার দায়িত্ব?"

আন্ বল্ল—"দেখ—ঠাট্টা করেও অশ্লীলতা আমার অসহ্য।"

"ঠাট্টা কে করছে? আর পাঁচজনের মত উনিও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে অথবা উচিতবোধে বিয়ে করেছিলেন। উনিও সন্তান ধারণ করেছিলেন এবং সন্তান যে কোথা থেকে আসে সে কথা অজানা নেই নিশ্চয়ই!"

আনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ঝলসে উঠ্ল—"তুমি যতটা জান, ততটা নয়—তবে একটা ধারণা আছে বৈকি।"

"উনি তাঁর সন্তানকে মানুষ করেছেন। হয়ত বা প্রেমে পড়ার মত কষ্ট স্বীকার করতে চান্নি। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীদের মত উনিও কোন এক ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন এবং এইটাই ওঁর মস্ত গর্বের বিষয়। মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ একটি বৌ হয়ে, মা হয়ে জীবনটা কাটিয়েছেন এবং সেই পরিস্থিতি বিপর্যস্ত করার কোন চেষ্টা করেন নি—এই তাঁর

অহঙ্কার। তিনি যা করেছেন তার জন্য নয়, যা করতে পারেননি সেই আনন্দে ফেটে পড়ছেন।”

বাবা বল্লেন—“এর কোন মানে হয় না।” সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম—“এ যেন একটা খাঁচার পাখী, নিজের রূপে, নিজেই মুগ্ধ। উনি শুধু আওড়াচ্ছেন—‘এই আমার কর্তব্য’, ‘এই আমার কর্তব্য’—আসলে কিন্তু করেননি কিছুই। ওঁর পরিস্থিতিতে উনি যদি কুলমান বিসর্জন দিয়ে পথে বেরিয়ে আস্‌তেন তাহলে বরং বড়াই করার কিছু থাক্‌ত।”

আন্ জবাব দিল—“তোমার ধারণার মধ্যে নতুনত্ব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা বল্‌ছ তার মানে নিজেই তুমি বোঝ না।” বোধহয় আনের কথাই ঠিক। তখন আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো সত্যি মনে করতাম। বাবার এবং আমার জীবনধারার সঙ্গে এ ধারণার সঙ্গতি বেশী, কিন্তু আনের ঘৃণা আমায় আঘাত দিত। আর সব ব্যাপারের মত ব্যর্থতার প্রতি আসক্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। আন্ আমাকে মানুষ বলেই মান্‌ত না। আমার বুদ্ধির ওপর ওর কোন আস্থাই ছিল না। আমার সম্বন্ধে ওর এ ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্যে আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তখন ভাবিনি যে এত শীঘ্র সে সুযোগ আমার আস্‌বে এবং আমি তার সদ্ব্যবহার করতে পারব। অবশ্য মাস খানেকের মধ্যে যে কোন বিষয়ে আমার চিন্তাধারা যে পরিবর্তিত হবে, এ আর বিচিত্র কি? আমার কাছ থেকে বেশী আর কি আশা করা সম্ভব।

৫

তারপর একদিন ঘটনাপ্রবাহের মোড় ফিরল। সকালে উঠে বাবা বল্লেন,—সন্ধ্যেবেলা 'কান্‌স' এর নাচঘরে নাচতে, হয়ত বা একটু জুয়াও খেল্‌তে যাবেন। এখনও মনে আছে এল্‌সা সেদিন কি দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তার তাপদগ্ধ দেহ এবং আমাদের কিছুটা বা ছাড়াছাড়া ভাবের ফলে ও'র মনহারিণীর ভূমিকায় যে ভাটা পড়েছিল, তারই পুনরুদ্ধারের আশায় হয়ত সে এত খুশী হয়েছিল। আমি অবাক্ হয়ে দেখলাম—আন্‌ও বাবাকে সমর্থন করল। ও'কি সত্যি খুশী হ'ল ? খাওয়া দাওয়া সেরে আমি নৈশ উৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে নিজের ঘরে ঢুকলাম। এ সব ব্যাপারের উপযোগী একটিমাত্র পোষাকই আমার ছিল। বাবা এটা করিয়ে দিয়েছিলেন—পোষাকটা আমার বয়সের তুলনায় অত্যধিক দামী ও সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু বাবার পছন্দ বা অভ্যাসের বশে আমায় সর্বদা অত্যন্ত সৌখিন-ভাবে সাজাতে ভালবাসতেন। আমি নীচে গিয়ে দেখি নতুন একটা ডিনার-জ্যাকেট পরে অপূর্ব সুন্দর সাজে বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বল্লাম—"আমি যতজনকে জানি তাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশী সুন্দর।"

আধোবিশ্বাসে জবাব দিলেন বাবা—"সিরিল ছাড়া! আর তুমি আমার চোখে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।" আমি চট্ করে জবাব দিলাম—"এল্‌সা আর আনের পরে।" যদিও মনে মনে স্বীকার করতাম না সে কথা। বাবা বল্লেন—"ওরা আমায় অপেক্ষা করিয়ে রাখে কোন সাহসে—বলতো! যাক্‌গে—এস, বুড়ো, বেতো বাপের সঙ্গে একটু নেচে দেখ ততক্ষণ।" অনেকদিন পরে আবার বাবার সঙ্গে বাইরে যাবার আনন্দে গায়ে কাঁটা দিল। বাস্তবিক বুড়ো বাপ বল্‌তে যা বোঝায় তার কোন লক্ষণই তাঁর মধ্যে ছিল না। নাচবার সময়ে ওঁ'র গায়ের পরিচিত ওডিকলোনের সঙ্গে তামাক মেশানো গন্ধটা নাকে এল। বাবা ধীরে ধীরে, অর্ধনিমিলিত নেত্রে নাচতেন, আর আমারই মত ঠোঁটের কোণে স্মিতহাসির রেখাটুকু উঠ্‌ত ফুটে। বাতের কথা ভুলে গিয়ে বাবা বল্লেন—"এক সময়ে তোমাদের সেই 'বোবপ্' ঢং-এর নাচটা শিখিয়ে দিওত মা।"

সবুজ একখানা সুন্দর পোষাক পরে, উৎসবের উপযোগী বিশেষ হাসিটি ঠোঁটের কোণে মাখিয়ে এল্‌সাকে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আস্‌তে দেখে, মিষ্টি হেসে বাবা ওকে অভ্যর্থনা করলেন। রৌদ্র-দগ্ধ কেশ ও ত্বকের শ্রী ফেরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বোঝা গেল। ফলে মোটামুটি সুন্দর লাগলেও, চমক্‌প্রদ বিশেষ কিছুই হয়নি। ভাগ্যক্রমে ও নিজে সে বিষয়ে সচেতন ছিল না। এল্‌সা বল্ল—"এবার বেরোন যাক্, কি বল?" আমি জবাব দিলাম—

"আন্ যে এখনও নাবেনি।" বাবা বল্লেন—"দেখ গিয়ে তার কদ্দূর হ'ল? 'কান্স' পৌঁছতে যে মাঝরাত হবে দেখ্ছি।"

মস্ত পোষাকে পা জড়িয়ে যায়, কোন রকমে দৌড়ে গিয়ে আনের দরজায় ঘা দিলাম। ও' আমায় ভেতরে ডাক্‌ল, আমি কিন্তু চৌকাঠেই আট্‌কে গেলাম। সাদা বল্লেও হয় এমনি হাল্কা একটা ধূসর রংয়ের পোষাক ও'র গায়ে। আলো পড়ে সেটাকে দেখাচ্ছিল যেন রাত্রিশেষের সমুদ্রের মত। পরিণত বয়সের এমন রূপ আর দেখিনি কখনও। আমি চিৎকার করে উঠ্‌লাম—"আন্—একি করেছ তুমি? কি অপূর্ব পোষাক পরেছ?" যেন আর কাউকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে এইভাবে আয়নাতে নিজের ছায়া দেখে অল্প হেসে বল্ল—"হ্যাঁ, এই ধূসর রংটা বেশ উৎরেছে।"

আমি বল্লাম—"তোমার সব কিছুই সার্থক।" ও' আমার কান মলে দিল, গাঢ় নীল চোখ দুটো খুশীতে চক্‌চক্ করে উঠ্‌ল। ও বল্ল—"সময়ে সময়ে বড্ড জ্বালাতন কর, এই যা তোমার দোষ। নইলে ভালই লাগে তোমাকে।" আমার পোষাকের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে আমার আগে আগে বেরিয়ে গেল। এক হিসেবে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। তবু কোথায় যেন ব্যথা পেলাম। আমি ও'র পেছনে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসতে আসতে লক্ষ্য করলাম বাবা ও'কে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসছেন। শেষ ধাপে একটা পা রেখে, মুখখানা উপর দিকে

ফিরিয়ে উনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এল্‌সা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে দৃশ্য আজও আমার চোখের ওপর ভাস্‌ছে। প্রথমে আমার সামনে আনের সোনালী ঘাড় ও অপূর্ব গড়নের কাঁধ, একটু নীচে হাত দুটো আনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রূপমুগ্ধ বাবার মুখখানা—সবশেষে এল্‌সার ছায়া!

বাবা বল্লেন—"আন্ তুমি অপরূপ!" হাসিমুখে বাবার পাশ কাটিয়ে গিয়ে কোট্‌টা তুলে নিয়ে বল্ল—"ক্যাসিনোতে দেখা হবে, কি বল? সেসিল্ আস্‌বে আমার সঙ্গে?"

ও'র গাড়ী আমিই চালিয়ে নিয়ে গেলাম। রাত্রে রাস্তাটা এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে খুব আস্তেই চালাচ্ছিলাম। আন্ সারাক্ষণ চুপ করে বসে রইল—রেডিওর শব্দও যেন ওর কানে যাচ্ছে না। একটা বাঁকের মুখে বাবার গাড়ীটা যখন আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, তখনও কোন রকম সাড়াশব্দ করল না। আমার মনে হল এই ঘোড়-দৌড়ের খেলায় আমি হেরে যাচ্ছি। একটা ঘটনা চোখের ওপর দিয়ে ঘটে চলেছে, তার মধ্যে আমার ঠাঁই নেই।

ক্যাসিনোতে গিয়ে বাবার চেষ্টায় আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে পরস্পরের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম। আমি, এল্‌সা আর তার এক অর্ধমত্ত মার্কিনীবন্ধু এক সঙ্গে জুটে গেলাম। ঐ লোকটি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সে বিষয়ে তার আগ্রহ এত বেশী ছিল যে মাতাল অবস্থাতেও বেশ জমিয়ে তুল্‌ল। ঘণ্টাখানেক

তার সঙ্গে মন্দ কাটল না, কিন্তু এল্‌সার ভাল লাগছিল না। মস্ত মস্ত নামজাদা লোকেদের সম্বন্ধে ও'র কৌতূহলের অন্ত ছিল না, কিন্তু মঞ্চ-জগতের বাইরেই তার আগ্রহ ছিল সীমাবদ্ধ। হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করল, বাবা কোথায়! আমিই বা জান্‌ব কি করে? ও' উঠে পড়ল। প্রথমটা মার্কিনী লোকটা দমে গেল, পরক্ষণে খানিকটা হুইস্কি গিলে মেজাজটা আবার সাঁৎলে নিল। আমার মাথায় তখন কিছুই ঢুকছিল না। ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে মদ আমার মাথায় চড়েছিল। তারপর ও যখন আমার সঙ্গে নাচ্‌তে চাইল, তখন সে এক ব্যাপার! ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে ওর পায়ের নীচ থেকে আমাব পা ভুখানা টেনে হিঁচ্‌ড়ে বের করতে আমার রীতিমত গায়ের জোর লাগছিল। আমরা এত হাসছিলাম যে, এল্‌সা যখন আমার কাঁধে টোকা মেরে ডাক্‌ল, ও'র "ক্যাসেণ্ড্রা"র মত মুখের অবস্থা দেখে আমার বলতে ইচ্ছে হ'ল—"চুলোয় যাও।" এল্‌সা বল্ল—"ওদের খুঁজে পেলাম না।" ও'র মুখে হতাশার ছবি আঁকা। পাউডার গলে গিয়ে চক্‌চকে মুখখানা ব্যর্থতায় বিকৃত, সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য! হঠাৎ বাবার ওপর প্রচণ্ড রাগ হল—এ কি ধরনের নিষ্ঠুরতা!"

যেন সব ঠিকমতই চলেছে, উতলা হবার কোন কারণ নেই, এইভাবে হাসতে হাসতে বল্লাম,—"আমি জানি কোথায় ওরা। দাঁড়াও, এক্ষুণি আস্‌ছি।" আমার বাহুমুক্ত হয়ে মার্কিনী তার

দেহভার এল্‌সার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মহাসুখী! একটু যেন দুঃখই হ'ল—এল্‌সার গড়নটা কি সুন্দর—ভরা নদীর মত কূলছাপানো। এই একটা জায়গায় এল্‌সার কাছে হেরে আছি আমি।

ঐ বিরাট 'ক্যাসিনো'টা দু'বার প্রদক্ষিণ করেও বাবা আর আনের কোন হদিস্ পেলাম না। শেষটা দালান থেকে হঠাৎই গাড়ীটার কথা মনে হল। মাঠের মধ্যে খুঁজে বের করতে সময় লাগল। গাড়ীর পেছনের জানালা দিয়ে ওঁদের দেখ্‌তে পেলাম। বাতির আলো পড়ে কাছাকাছি দুখানা মুখ অপূর্ব গম্ভীর ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি ওঁদের ঠোঁট নড়া দেখে বুঝলাম ওঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছেন। একবার মনে হল ফিরে যাই, কিন্তু এল্‌সার কথা মনে হতে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেল্লাম। আনের হাত ধরে বাবা এমন তন্ময় হয়েছিলেন যে, আমায় দেখতেই পেলেন না। আমি খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম—"দুজনে বেশ আনন্দেই আছ, দেখতে পাচ্ছি।" বাবা চটে গিয়ে উত্তর দিলেন—"ব্যাপার কি? এখানে কি হচ্ছে শুনি?" "আর তুমিই বা কি করছ এখানে? এল্‌সা ঘণ্টাখানেক ধরে তোমায় খুঁজে মরছে যে!" নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আন্ এবার আমার দিকে মাথাটা ফিরিয়ে বল্ল—"আমরা বাড়ি যাচ্ছি। ওকে বল আমার কষ্ট হচ্ছিল—সেইজন্য তোমার বাবা আমায় বাড়ি পৌছে দেবেন বলেছেন।

তোমাদের হৈ চৈ শেষ হলে আমার গাড়ী নিয়ে ফিরে এস যখন খুশী।"

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, মুখ দিয়ে কথা সরল না। দম নিয়ে বল্লাম—"হৈ চৈ শেষ হলে, মানে? তোমরা কোথায় গড়িয়ে চলেছ, সে খেয়াল আছে? কি যা তা শুরু করেছ?" অবাক্ হয়ে বাবা প্রশ্ন করলেন—"কি বলছ তুমি? কী যা' তা' শুরু করেছি আমরা?"

আমি উত্তর দিলাম—"তুমি একটি মেয়েকে রিভিয়েরায় নিয়ে এলে—প্রচণ্ড রোদে তার শরীর ঝলসে গেল। তাই দেখে তুমি তাকে ত্যাগ করবে? ভারী সোজা—না? কি বল্‌ব আমি ওকে এখন?"

আন্ বিরক্তিভরে মুখ ফেরাল, বাবা আমার কথায় কান না দিয়ে ও'র দিকে চেয়ে হাসলেন। রাগে আমি আত্মহারা হয়ে বল্লাম—"ঠিক আছে। আমি ওকে বলব যে রাত্রের জন্যে বাবার এক নতুন সঙ্গী জুটেছে। তোমার প্রয়োজন মিটেছে। ভবিষ্যতে আবার আস্‌তে পার। এই তো?" বাবার হুঙ্কার আর আনের চড় দুটো এক সঙ্গেই এল। আমি গাড়ীর ভেতর থেকে চট্ করে মাথাটা বের করে নিলাম। গালের ওপর আনের চড়টা মধুবর্ষণ করেনি।

বাবা বল্লেন—"ক্ষমা চাও এই দণ্ডে।" আমার মাথার ভেতর বিচিত্র চিন্তার ঝড় বয়ে গেল। চড়া কথা বলে ফেলে,

নিজের ভুল বুঝতে আমার সর্বদাই দেরী হয়ে যায়! আন্ ডাকল—"এদিকে এস।" ওর গলার স্বর থেকে রাগের শেষটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে দেখে এগিয়ে এলাম। গালের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে, আমি যেন একটা বোবা মেয়ে এইভাবে খুব নরম গলায় বল্ল—"দুষ্টুমি করে না, ছিঃ। এল্সার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু ও'কে বোঝাবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি তোমার আছে। কাল আমরা এবিষয়ে আলোচনা করব—কেমন? গালে কি খুব লেগেছে?" আমি ভদ্রভাবেই উত্তর দিলাম—"বিশেষ কিছু নয়।" আমার চণ্ডালে রাগের পর আনের ঐ মিষ্টি ব্যবহারে জল এল চোখে। চুপ্সে যাওয়া বেলুনের মত সম্পূর্ণ নিভে গিয়ে আমি ওদের গাড়ী করে চলে যেতে দেখলাম। আমার বুদ্ধির তারিফ করে গেল আন্—এইটুকুই সান্ত্বনা রইল আমার।

ক্যাসিনোতে ফিরে গিয়ে মার্কিনীটাকে এল্সার কণ্ঠলগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। আল্গোছে বল্লাম—"আনের শরীরটা খারাপ লাগছিল, তাই বাবা ওকে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। এস না—কিছু একটু ড্রিংক করা যাক!" জবাব না দিয়ে ও আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। জবরদস্ত রকম কিছু একটা বলা দরকার মনে হ'ল—বল্লাম—"আন্ সত্যিই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ওর পোষাকটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।" এটুকু বলে মনে হ'ল—যেন গল্পটা ঠিকমত জমেছে,

কিন্তু এল্‌সা নীরবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—এদিকে আমি নিরুপায় ! "সেসিল্—আমরা কি আনন্দেই না ছিলাম।" যত বলে তত আরো বেশী করে কাঁদে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনীটাও ফোঁপাতে লাগ্‌ল—"হায় ! হায় ! আমরা কি আনন্দেই না ছিলাম।" সেই মুহূর্তে আমার চোখে আন্ আর'বাবা বিষ হয়ে গেলেন। এল্‌সার কাজলধোয়া চোখের জল মুছিয়ে দিতে—আর ঐ মার্কিনীটার বিকট চিৎকার থামাতে আমি তখন সবকিছু করতে রাজী ছিলাম। ওকে সান্ত্বনা দিতে বল্লাম—"এখনও কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না, এস আমার সঙ্গে বাড়ি চল।" কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল—"পরে গিয়ে স্যুট্‌কেশ্‌টা নিয়ে আস্‌ব একদিন। বিদায় সেসিল্। সেসিল্ আমাদের সম্পর্কটা কেমন সুন্দর জমে উঠছিল—না ?" সাজ পোষাক বা আবহাওয়া ছাড়া কোনদিন ওর সঙ্গে আমার অন্য কোন বিষয়ে কথা হয়নি, তবু, তবু মনে হ'ল যেন সমব্যথী কোন বন্ধুকে হারালাম—এই মুহূর্তে। হঠাৎ পেছন ফিরে গাড়ীটার দিকে দৌড় দিলাম।

৬

গতরাত্রে অত্যধিক হুইস্কি খাওয়ার ফলে সকালবেলাটা আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে ঘুম ভেঙ্গে দেখি যে, বিছানায় আড়াআড়ি পড়ে আছি, জিভ্‌টা ভারী হয়ে গেছে, হাত পা গুলোয় অসহ্য স্যাঁৎসাঁতে ভাব। বন্ধ জানলার পাখীগুলোর মধ্য দিয়ে সূর্যালোকের একটি রেখা আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে, তার মধ্যে অসংখ্য জীবাণু কিল্‌বিল্‌ করছে। বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি নেই, অথচ ঐভাবে পড়ে থাকতেও ইচ্ছে করেনা। হঠাৎ এল্‌সা এসে দাঁড়ালে বাবা আর আনের কী অবস্থা হবে ভেবে কুল পাচ্ছি না। শেষপর্যন্ত আমার ঘরের ঠাণ্ডা টালির মেঝের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আর কেমন যেন টল্‌মলে অবস্থা।

আয়নায় নিজের ছায়া দেখে কান্না পেল। আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন অচেনা আর কাউকে দেখছি এইভাবে নিজের ফোলা ফোলা চোখ আর শুক্‌নো ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঐ কি আমার মুখ? আমার স্বভাবগত দুর্বলতার জন্যে কি ঐ ঠোঁট দুটো, শরীরের এই অস্বাভাবিক অপরিণত গড়নই দায়ী? তাছাড়া শরীরের এই পরিপূর্ণতার অভাব সম্বন্ধে

আজকেই কেন বিশেষ করে সজাগ হয়ে পড়েছি? উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে রসকষহীন এই মুখের ডৌল; আমার সমস্ত আকৃতিটার উপবে ঘৃণায় ভরে উঠ্‌ল মন। আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আওড়ালাম—"উচ্ছৃঙ্খলতা", "যথেচ্ছাচারীতা"। তারপর হঠাৎ আমার ছায়াটা যেন হেসে উঠ্‌ল। হায়! কি দারুণ ব্যভিচারিণী। কয়েক গেলাস মদ, গণ্ডদেশে একটি চপেটাঘাত আর কয়েক ফোঁটা চোখের জল।...দাঁত মেজে নীচে নেমে গেলাম। বাবা আর আন্‌ আগে থেকেই বারান্দায় জলখাবারের সরঞ্জাম সামনে নিয়ে পাশাপাশি বসেছিলেন। আমি উল্টোদিকে বসে কোনরকমে সুপ্রভাত জানালাম। নিজের মনে গ্লানি থাকায় চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না—কিন্তু ওঁদের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে, চোখ তুলে চাইতে বাধ্য হ'লাম। সুখরজনীর একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ আনের মুখে ক্লান্তির ছায়া দেখলাম। তু'জনেই সুখের হাসি হাসছিলেন। এই দৃশ্য আমায় অভিভূত করল, কারণ সুখ আমার কাছে তুর্লভ বলেই মনে হ'ত।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—"রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো মা?" আমি জবাব দিলাম—"মন্দ নয়, কাল হুইস্কির মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছিল।" আমি কফি ঢেলে নিলাম কিন্তু প্রথম চুমুকের পরেই তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা নাবিয়ে রাখলাম। কেমন যেন মনে হ'ল ওদের না-বলা কথার মধ্যে অনেক কিছু বলার

যেন লুকিয়ে আছে। আর চুপ করে থাকতে পারলাম না,—"ব্যাপার কি? তোমাদের রকমসকম এমন হেঁয়ালী ঠেক্‌ছে কেন?" বাবা একটা সিগ্রেট্ ধরালেন আর আন্ জীবনে বোধ-হয় এই প্রথম বিব্রত বোধ করল। শেষ অবধি সেই বল্ল,—"তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার বাবা আর আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।" প্রথমে ওর দিকে, পরে বাবার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম। বাবার কাছ থেকে কোন ইঙ্গিতের আশা করেছিলাম। অবাঞ্ছিত হ'লেও তাঁর ইশারায় অনেকটা ভরসা পেতাম। কিন্তু তিনি চোখ নীচু করে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল এ অসম্ভব! কিন্তু ততক্ষণে বুঝতে পারলাম, ঘটনাটা সত্যি! ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিয়ে বল্লাম—"অতি উত্তম প্রস্তাব।"

যে বাবা এতদিন বিবাহ্ বন্ধনের ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন, একরাত্রের মধ্যে তাঁর এই পরিবর্তন অবিশ্বাস্য। আমাদের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেবার সময় এল এতদিনে। আমাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের একটা ছবি ভেসে উঠ্‌ল চোখের উপর। সেখানে আনের একচ্ছত্র আধিপত্যে আমাদের জীবন-ধারা নতুন করে, সুমার্জিত, সুসংবদ্ধ পথে পরিচালিত হবে। এটা আনের বিশেষত্ব এবং এইজন্যই আমি ওকে এতদিন হিংসা করে এসেছি। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের গণ্ডী বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ

ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। সন্ধ্যাগুলো কাট্‌বে মধুর পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে। ডিনার টেবিলে মাতালের হট্টগোল, মার্কিনীদের সঙ্গ, এল্‌সার মত মেয়েদের ঘৃণা করতে শিখব আমি। এবার একটু জোর দিয়েই বল্লাম—"চমৎকার, প্রস্তাব।" বাবা বল্লেন—"আমি জানতাম তুমি খুশী হবে, ছুলালী আমার!" ওঁর মনটা হাল্কা হয়ে গেল, খুশী হ্লেন বোঝা গেল।

প্রেমের স্পর্শে আনের মুখে কোমলতার ছায়া পড়ে ও'কে আরও সুন্দর, আরও আপন বলে মনে হ'ল। বাবা হাত বাড়িয়ে আমায় ওঁদের আরও কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন—"কাছে এস, মানিক আমার।" আমি ওঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলাম। ওঁ'রা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। তবু একটা কথা বারবারই মনে হতে লাগ্‌ল যে, ওঁদের সামনে আমার সংস্থা ছোট একটা বেড়াল ছানা, একটা পোষা জন্তুর চেয়ে বেশী নয়। ভূত ভবিষ্যতের এক অচ্ছেদ্য সূত্রে যেন তাঁরা বাঁধা পড়েছেন, যেখানে আমার কোন স্থান নেই। কিন্তু আমি জোর করে চোখ বুজে, ওদের কোলে মাথা রেখে, হাসিমুখে পড়ে রইলাম কারণ বাস্তবিকই আমি খুশী হয়েছিলাম। আন্ সর্বদা সোজা পথে চল্‌ত অন্ততঃ উদারতার অভাব তার ছিল না। আমায় সে পথের ঠিকানা বলে দেবে, আমায় দায়মুক্ত করবে, প্রয়োজনের সময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে। বাবাকে আর আমাকে পূণ্যের জাহাজ করে ছাড়বে।

বাবা এক বোতল স্যাম্পেন আন্‌তে গেলেন। মনটা আমার হঠাৎই দমে গেল। বাবা যে খুশী হয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু নারীজাতির সান্নিধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ এই তো প্রথম নয়! আন্ বল্ল—"আমার কেমন যেন তোমার সম্বন্ধে ভয় ছিল।" অবাক্ হলাম—"কেন?" মনে হ'ল একটা "হ্যাঁ" এর অভাবে ওদের বিয়ে বন্ধ হয়ে যেত। হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিল,—"আমার ভয় ছিল তুমি আমায় ভয় পাও।" আমিও হাস্‌তে শুরু করলাম কারণ ওর অনুমান তো মিথ্যে নয়! আন্ আমায় বুঝিয়ে দিল যে আমার ভয়টা ও আগে থেকেই টের পেয়েছিল, কিন্তু বাস্তবিক ভয়ের কিছু নেই। আমায় জিজ্ঞেস করল—"আমাদের মত বুড়োবুড়ির বিয়ে তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে না?"

বাবাকে বোতল নিয়ে লোফালুফি করতে করতে এগিয়ে আসতে দেখে, আমি একটু জোর দিয়ে বল্লাম—"তুমি মোটেই বুড়ো হওনি!" আন্ এমন একটা ভঙ্গিতে বাবার দিকে ফিরল যে, আমায় চোখ নীচু করতে হ'ল। ওর বিয়ে করার আর কোন উদ্দেশ্য থাক্‌তেই পারেনা। বাবার দৃঢ় আলিঙ্গনের আকর্ষণ, বাবার প্রাণপ্রাচুর্য, বাবার সঙ্গসুখ এই সবই ও'কে বাবার দিকে টানছিল। চল্লিশ বছর বয়সে নিঃসঙ্গ বোধ করা স্বাভাবিক, কিম্বা হয়ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি নির্বাপিত হবার আগে এ তার শেষ দাহনজ্বালা—মুস্কিল এই যে আন্‌কে ব্যক্তিত্বের

প্রতিমূর্তি হিসেবেই জেনেছি এতদিন, সে যে নারী, একথাই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বরাবর আত্মসমাহিত, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু তারও যে দুর্বলতা, দৈহিক কামনাদি থাকতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। গর্বিতা আন্ লারসন্ স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে এই সুখে বাবার যে অহঙ্কার হবে, এ আর আশ্চর্য কি? কিন্তু আন্‌কে কি সত্যিই তিনি ভালবেসেছিলেন, বা বরাবর ভালবাসতে পারেন? এল্‌সার প্রতি তাঁর যে মনের ভাব তার সঙ্গে আজকের এই ভালবাসার পার্থক্য কোথায়? রোদে মাথা ঘুরছিল, আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমরা তিনজনেই না বলা যত ভাবনা, ভয় ও আনন্দের ভারে চুপ করে—বারান্দায় বসে রইলাম।

এর মধ্যে এল্‌সা আর আসেনি। এক সপ্তাহ, পুরো সাতটা দিন তিনজন পরস্পরকে জড়াজড়ি করে, সুখে সোহাগে কেটে গেল। তারপর ঘটনার মোড় ঘুরল। এই কটা দিনের মধ্যে আমরা আমাদের প্যারিসের বাড়িখানা নতুন করে ঢেলে সাজাবার জল্পনা কল্পনা করতে লাগলাম। জীবনে যারা কোন দিন বাঁধাধরা নিয়মে চলেনি, তাদের মত অহেতুক জেদ করে আমরা আমাদের জীবনে নিয়মানুবর্তিতা চালু করার সঙ্কল্প করলাম। বাবা কি সত্যি ভেবেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটা ধরে নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে আহার,

রোজ রাত্রে ডিনারে বাড়িতে উপস্থিত থাকা, আর সন্ধ্যেটা শান্ত পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে কাটানো সম্ভব হবে। যাই হোক্ তিনি যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে নিয়মানুবর্তিতা প্রচার করতে শুরু করলেন এবং অভিজ্ঞাত শ্রেণীর মত পরিপাটী, সাজানো গোছানো সংসারের আনন্দ উপভোগে প্রবৃত্ত হলেন। আমার পক্ষে যেমন, ঠিক তেমনি তাঁর পক্ষেও এ শুধু আকাশ-কুসুম গড়া।

আহা! সেই সপ্তাহটা আজও মনে আছে। আন্ দেহে, মনে স্বচ্ছন্দ হয়ে আরও মধুর হয়ে উঠল। বাবা ও'র প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। সকালবেলা পরস্পরের দেহে ভর দিয়ে তু'জনে হাসতে হাসতে নীচে নেমে আসতেন। চোখের কোলে সুখ রজনীর ছায়া। ওঁদের সেদিনের সেই সুখ চিরস্থায়ী হোক্। এর বেশী কোন কামনা আমাদের ছিলনা। সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই সমুদ্রের ধারে কোন কাফের বারান্দায় বসে আমরা হাল্কা কিছু পান করতাম। সর্বত্র, সবাই আমাদের একটি সুখী পরিবার বলে মেনে নিল। বাবার সঙ্গে আগে যখন যেখানেই গিয়েছি, সবার ঠোঁটে একই রকম বাঁকা হাসি, চোখে সেই করুণার ছায়া দেখে বিতৃষ্ণা এসেছিল জীবনে; আজ সে জায়গায় আমার বয়সোপযোগী কুমারী কন্যার ভূমিকায় নিজেকে খুঁজে পেয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল মন। প্যারিসে ফিরে গিয়েই বিয়েটা হবে স্থির হ'ল।

বেচারা সিরিল—আমাদের এই আপেক্ষিক পরিবর্তনে অবাক্ হয়ে গেল, কিন্তু এবারের এই বৈধ যোগাযোগের আশায় সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্ল। আমরা আগের মতই নৌকা চালিয়ে বেড়াতাম এবং ইচ্ছা হলেই চুমু খেয়ে আশ মেটাতাম। কিন্তু মাঝে মাঝে সিরিল যখন আমায় চুমু খেতো তখন প্রতি প্রভাতে আনের পরিতৃপ্ত মুখখানা আমার চোখের উপর ভেসে উঠত। ওর স্বচ্ছন্দ অঙ্গভঙ্গী, ভরে ওঠা শরীরের কোমল রেখাগুলো যে, প্রেমেরই অবদান একথা মনে করে হিংসা হ'ত। কেবলমাত্র চুম্বনের সাধ্য কি এ পরিতৃপ্তি দেবার? সিরিল যদি আমায় এত ভাল না বাসত তবে সেই সপ্তাহেই আমি হয়ত ওর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতাম।

ছ'টার সময়ে দ্বীপপুঞ্জের আশপাশ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরে সিরিল নৌকাটা বালির ওপর টেনে নিত। পাইন বনের ভেতর দিয়ে এক এক করে আমরা বাড়ি ফিরে আসতাম! ভাবটা, আমরা যেন রেড ইণ্ডিয়ান্, রেড্ ইণ্ডিয়ান খেল্‌ছি! কিম্বা হৈ হৈ করে করে খানিকটা দৌড়ে নিতাম, বাড়ি পৌঁছবার আগেই ও আমায় ধরে ফেলত। তারপর প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে, কাঁটাবহুল পাইন বনের ওপর আমায় ফেলে দিয়ে হাতদুটো মাটির ওপর চেপে ধরে চুমু খেতো। এখনও সেই দম আটকানো চুম্বনের স্বাদ আমার মনে আছে। আমি যেন আজও আমার বুকের ওপর সিরিলের বুকের স্পন্দন শুনতে পাই। সমুদ্র তরঙ্গের ছন্দবদ্ধ

শব্দমালার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের স্পন্দন যেন এক হয়ে মিশে যেত,—এক, দুই, তিন……। তারপর দম্ ফিরে এলে ওর চুম্বনের মধ্যে আকুলতা আরও প্রকট হয়ে উঠত, সমুদ্রকল্লোল স্তিমিত হয়ে, শুধুমাত্র তারই প্রাণস্পন্দন আমার কানে আসত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আনের কণ্ঠস্বরে আমাদের এই আলিঙ্গন-পাশ বিচ্ছিন্ন হ'ল। সিরিল আমার বুকের ওপর শুয়েছিল। সূর্যাস্তের অরুণীভা আমরা অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় উপভোগ করছিলাম এবং এইভাবে আমাদের দেখে বিভ্রান্ত হওয়া বিচিত্র ছিলনা। আন্ কঠোর স্বরে আমায় ডাক দিল। কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে সিরিল উঠে দাঁড়াল। আনের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে আমি আস্তে, ধীরে উঠে পড়লাম। সিরিলের অন্তরাত্মা বিদ্ধ করে, সংযতস্বরে আন বল্ল—ভবিষ্যতে তোমার আর মুখদর্শন করতে চাইনা।

সিরিল কোন উত্তর না দিয়ে নীচু হয়ে আমার কাঁধে চুমু খেয়ে চলে গেল। আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হ'লাম, ওর আচরণের মধ্যে দিয়ে কি যেন অঙ্গীকার করে গেল। আন্ আমার দিকে তেমনি গম্ভীর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যেন আর কিছু ওর মাথায় ঘুরছে। ওর ব্যবহারে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভাবনার যদি কূলকিনারা না পাবে, তবে কিছু বলতে আসাই বা কেন? যেন খুব অপ্রস্তুত হয়েছি, এইভাবে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। এতক্ষণে যেন ও আমায় দেখ্তে পেল এমনি অন্য-

মনস্কভাবে আমার কাধের ওপর থেকে একটা পাইনের কাঁটা হাত দিয়ে ফেলে দিল। ওর মুখের ওপর চমৎকার একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠ্‌ল ; খানিকটা দুশ্চিন্তা, খানিকটা অহমিকার ভাব ; এটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এইজন্যেই ওকে আমি এত ভয় পেতাম।

শেষপর্যন্ত ও বল্ল—"তোমার বোঝা উচিত এই জাতীয় আমোদ-প্রমোদের ফল কি মারাত্মক হতে পারে—হাসপাতালে সাধারণতঃ এর সমাপ্তি ঘটে।" সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আমি যেন মরমে মরে গেলাম। ও সেই দলের মেয়ে যারা কথা বলার সময়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি সর্বদা একটা চেয়ার বা অন্য কোন জিনিষ, যেমন হাতে সিগ্রেট্‌টা ধরে কথা বলতাম। কিম্বা একটা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, অন্যটা দোলাতে দোলাতে সেইদিকে তাকিয়ে কথা বল্‌তাম। হেসেই জবাব দিলাম—"বাড়াবাড়ি করছ কেন? আমরা শুধু চুমু খাচ্ছিলাম, এরজন্যে হাসপাতালে যেতে হ'তো না।" যেন আমার কথা বিশ্বাস হ'লনা—এইভাবে আবার বল্ল—"ওর সঙ্গে মিশনা। আমার কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করোনা, তোমার বয়স মাত্র সতেরো। তাছাড়া এখন তোমার দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে খানিকটা। এভাবে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে আমি কিছুতেই দেবনা। যাইহোক্ তোমার পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, এবার থেকে বিকেলে

পড়তে বস্‌বে।” আমার দিকে পেছন ফিরে তার স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়াভাবে হন্‌হনিয়ে চলে গেল, আমি হতভম্ব হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন সে আমাকে,—যে সেসিলকে এতদিন জেনে এসেছে তাকে এইভাবে পায়ে দলে, তার অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে, সেখানে আমার কোন প্রতিবাদের কি মূল্য আছে? এই ঔদাসীন্যের চেয়ে ও' যদি আমায় ঘৃণা করত, তাও যেন সহ্য হ'ত। আমার একমাত্র ভরসা এখন, বাবা। উনি নিশ্চয়ই সব শুনে জিজ্ঞেস্ করবেন শুধু,—“তা, এবারকার ভাগ্যবান পুরুষটি কে মা? আশাকরি তার চেহারা আর স্বাস্থ্যটা অন্ততঃ ভাল। কিন্তু মা মনি নেকড়ে জাতীয় বুনো লোকগুলো থেকে তফাতে থেকো।” ঠিক এইভাবে যদি বাবা সমস্ত ব্যাপারটা হাল্কা করে না নেন্—তবে এবারকার মত ছুটির আনন্দে এখানেই আমায় ইস্তফা দিতে হবে।

রাত্রে খাবার সময়টা দুঃস্বপ্নের মত কাট্‌ল। আন্ আমায় একবারও বলেনি যে, আমি যদি মন দিয়ে পড়াশোনা করি, তবে বাবাকে আজকের ঘটনাটা জানাবে না! এইভাবে কাজ আদায় করার মেয়েই সে নয়। ওর স্বভাবটা আমার অত্যন্ত ভাল লাগ্‌ত, কিন্তু ওকে ছোট করার মত কোন অজুহাত যদি পেতাম তবে যেন বেঁচে যেতাম। বরাবরের মত এবারেও সে ভুল চাল দিল না। সুপ্‌টা সবেমাত্র শেষ করেছি, এমন সময়ে হঠাৎই

যেন ব্যাপারটা মনে পড়ল। আন্ বল্ল—"রেমঁদ তোমার মেয়েকে বোঝাও। আজ সন্ধ্যেবেলা পাইন বনের মধ্যে ওকে আর সিরিলকে যে অবস্থায় দেখেছি, সেটা ভব্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।" বেচারা বাবা, সমস্ত ঘটনাটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন—"কি ব্যাপার? করছিল কি ওরা?" আমি প্রতিবাদ করলাম—"ও আমায় চুমু খাচ্ছিল, তাই দেখে আন্ ভাব্‌ল—"। বাধা দিয়ে আন্ বল্ল—"আমি কিছুই ভাবিনি। তবে ওর পক্ষে এখন কিছুদিন সিরিলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে 'দর্শন শাস্ত্রে'র দিকে মন দিলে ভাল হয়।"

বাবা বলেন—"বাছা আমার! যাই বল সিরিল ছেলে ভাল।" আন্ জবাব দিল—"আর আমাদের সেসিল্ই কি খারাপ মেয়ে? তা নয়! সেজন্যই তো ওর কিছু হলে আমার সইবে না। অথচ ও যদি এরকম দড়িছেঁড়া বাছুরের মত যা খুশী করে বেড়ায়, তবে অঘটন ঘট্‌তে কতক্ষণ? ও আর সিরিল সারাক্ষণ একসঙ্গে বেড়াচ্ছে, দুজনেরই করবার কিছুই নেই। কাজেই এর বেশী আর কি আশা করা যায়। তুমিই বল না।" ওর শেষের কথাগুলোয় চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হ'লাম, এদিকে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বাবা চোখ নীচু করলেন। উনি বল্লেন—"কথাটা তোমার সত্যি। সেসিল্! কিছু একটা তোমার করা উচিত নিশ্চয়ই। আবার 'দর্শনে' ফেল করে, ফিরে পড়তে চাওনা আশাকরি।"

আমি চট্ করে জবাব দিলাম—"তাতে কি এসে যায়?" বাবা একবার আমার দিকে চেয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। আমি বিচলিত হ'লাম। বুঝলাম জীবনে অসাবধান হয়ে চলা খুব সহজ, কিন্তু তাকে সমর্থন করা শক্ত।

টেবিলের ওপাশ থেকে আমার হাতটা টেনে নিয়ে আন্ বল্ল—"শোন, ঠিক্ একমাস তোমার 'বনদেবী'র ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মী পড়ুয়া মেয়ে হতে পার না? কাজটা কি খুব কঠিন?" দুজনেই আমার দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন। এভাবে বিচার করলে অবশ্য যুক্তিটা অকাট্য। আস্তে হাতটা টেনে নিলাম। প্রায় মনে মনে বল্লাম—"হ্যাঁ, খুবই শক্ত কাজ।" ওঁরা হয়ত শুনেও শুনলেন না। পরদিন সকালে 'বার্গস'ঁর একটা প্যারা চোখে পড়ল—"কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিতর যুক্তি প্রথমে যতই অসঙ্গত মনে হউক না কেন এবং সকল বস্তুর মূল সূত্র সন্ধানের যদিও কোন রীতি ধার্য করা অসম্ভব, তথাপি মনুষ্যজীবনে সৃজনীশক্তির সহিত মনুষ্যত্বের প্রতি আকর্ষণের একটি সম্বন্ধ নির্দেশ করা যায়।" কিছুতেই উত্তেজিত হবনা এই ভেবে প্রথম প্যারাটা মনে মনেই পড়লাম, তারপর গলা ছেড়ে দিয়ে আর একবার পড়লাম। মাথাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। শেষপর্যন্ত অর্থটা বোধগম্য হ'ল—কিন্তু প্রথমবারের মতই এবারেও প্রাণে কোন সাড়া জাগল না। আর পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

প্রাণপণ চেষ্টা করে পরের লাইনগুলো পড়ে দেখলাম, কিন্তু হঠাৎই যেন মনের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। আমি হুমড়ি খেয়ে বিছানাতে শুয়ে পড়লাম। সূর্যের আলো ঝল্‌মলে সেই খালটায় সিরিল আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে মনে পড়ল। নৌকার মৃদু মৃদু দোলা, আমাদের গাঢ় চুম্বনের স্বাদ, আর সেই সঙ্গে আনের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল। কিন্তু এই শেষের চিন্তা মাথায় আস্‌তে চট্‌ করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম এবং আমি যে একটি নিরেট অসভ্য অলস ও মন্দ মেয়ে এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হ'ল।

এসব অবান্তর চিন্তা করার আমার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আন্‌ যে আমার সুখের পথে কাঁটা এ ধারণা আমার গেলনা এবং তার হাত থেকে মুক্তি পাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। আমার ভেতরের এই ঘৃণা, এই বিদ্রোহের ভাব, যা আমার নিজের ওপর এমন বিতৃষ্ণা এনেছে, সেইভাব দমন করে কত কষ্টে যে ডিনারের সময়ে চুপ করেছিলাম, সে কথা মনে পড়ল।

এতক্ষণে সব জিনিষটা যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে—আমার নিজের সম্বন্ধে আমারই মনে ধিক্কার জাগ্‌ছে, এইটাই আনের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ। আনন্দের জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই ছিল আমার চরিত্রের রীতি, সেই জায়গায় আন্‌ আমার মধ্যে আত্মসমালোচনা ও ন্যায় অন্যায়

বোধ জাগিয়ে তুল্ছে। অন্তর্দৃষ্টিতে অভ্যস্ত আমার পক্ষে দিশেহারা হয়ে পড়া আর অসম্ভব কি? আমার কি উপকারটা করল সে। আমি হিসেব করে দেখলাম—ও আমার বাবাকে চেয়েছিল, বাবাকে পেয়েছে। আমাদের দুজনকে ক্রমে ক্রমে আন্ লারসেনের স্বামী ও সৎ মেয়ের পর্যায়ে নাবিয়ে আন্বে অর্থাৎ আমাদের দুটি মার্জিতরুচী ভদ্র ও আত্মতৃপ্ত প্রাণীতে পরিণত করবে। কারণ ও ওর মিষ্টি ব্যবহারে খুব সহজেই আমাদের বশ করে ফেলবে। ফলে আমাদের মত দুটি উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্ববোধহীন মানুষ অনায়াসে তার করতলগত হয়ে তারই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেব। এর মধ্যেই বাবার সঙ্গে আমার তফাৎ হয়ে গেছে। প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে যে! খাবার টেবিলে অপ্রস্তুত হয়ে বাবাকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে দেখে বড় আঘাত পেয়েছিলাম। আমাদের হাসিঠাট্টা, শেষরাত্রে প্যারিসের জনশূন্য রাজপথ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুজনের কৌতুক-উল্লাসের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে চোখে জল এল। সব শেষ হয়ে গেছে। আন্ আমাকে পরিবর্তিত, পরিশোধিত, পরিমার্জিত করে ছাড়বে। ওর প্রখর বুদ্ধি দিয়ে, হাসি গল্পের ভেতর দিয়ে, মধুর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ও আমাদের এমন করে জয় করবে যে আমরা টেরই পাবনা। এর বিরুদ্ধাচরণ করার কোন সাধ্যই আমার হবে না। দু' মাসের মধ্যে সে মনবৃত্তিও আমার থাক্বে না।

যেন তেন প্রকারেণ আমাকে বাঁচতেই হবে। বাবাকে ফিরে পেতেই হবে। আমাদের আগেকার দিনগুলো ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে। গত দু'বছর বাবার সঙ্গে আমার সেই দিনগুলো অপার আনন্দমুখর মনে হ'ল। মাত্র কয়দিন আগে আমরা সেই অবাধ স্বাধীনতা হারাতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমার নিজস্ব চিন্তা, যত ভুলই হোক্ না কেন, সে যে একান্ত আমারই স্বাধীন জীবন; যার ওপর হস্তক্ষেপের অধিকার কারো ছিল না। তাকেই আজ হারাতে বসেছি। যদিও 'অহং' এর ধারণা ছিল না মাথার মধ্যে, কারণ আমি যে এখনও কাদার তাল মাত্র রয়ে গেছি, তবু অপর কেউ এসে আমায় ঠুকে ঠুকে গড়বে—এ চিন্তা যে অসহ্য!

আমি জানি অনেকে আমার মধ্যে এই বিদ্রোহকে অত্যন্ত জটীল সংজ্ঞা দেবে। কেউ বা বল্‌বে, এ আমার বাবার প্রতি অবৈধ মনবৃত্তি, কিম্বা আনের সম্বন্ধে বিকৃত মনভাবের প্রকাশ মাত্র। আমি জানতাম এই নিদাঘসন্তপ্ত দিনগুলো, 'বার্গস' সিরিল, অথবা সিরিলের জন্য অভাববোধই এই সাময়িক উত্তেজনার কারণ। সারা বিকেল ধরে দুশ্চিন্তায় কাটল। আমরা আনের হাতের খেলার পুতুল, এই সত্য আবিষ্কার করা অবধি আমার মনে শান্তি ছিল না। চিন্তা করা আমার প্রকৃতির বাইরে ছিল, তাই এত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সকালের মত রাত্রে খাবার সময়েও আমি চুপ করে রইলাম। শেষ অবধি

থাক্‌তে না পেরে বাবা আমায় একটু ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে বল্লেন—"যৌবনকে এত ভালবাসি, তার কারণ তার স্বাচ্ছন্দ্য, তার উল্লাস!"

রাগে আমার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌ল। বাবার কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিলনা, কিন্তু তাঁকে হারালে আমার আর কথা বলার মত রইল কে? আমরা দু'জনে কি-না আলোচনা করেছি, প্রেম, মৃত্যু, সঙ্গীত। এখন তিনি নিজেই তো আমার মুখ বন্ধ করেছেন, আমার সঙ্গ বর্জন করেছেন! তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি মনে মনে বল্লাম—"তুমি আমায় আর ভালবাস না। তুমি আমাকেও ফাঁকি দিয়েছ।" কথা না বলে আমি ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমার অবস্থা কত মর্মান্তিক। আমার যেন মনবিকার ঘটেছে এম্‌নি মনে হ'ল। হঠাৎ বাবা যেন কিছু অনুমান করলেন; ঠাট্টা করার দিন ফুরিয়েছে, একথা যেন হঠাৎ মনে এল। আমাদের সম্পর্কে যেন কোথায় একটা ঘুণ ধরেছে এ আশঙ্কাও অনুভব করলেন বোধ হয়। আমি দেখলাম বাবা আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। আমায় কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আন্‌ প্রশ্ন করল—"তোমার চেহারাটা তো ভাল দেখাচ্ছে না। পড়তে বলে বোধ হয় ভুল-ই করলাম আমি।

কোন জবাবই দিলাম না। নিজেকে কিছুতেই সহজ করে আন্‌তে পারি না। কেমন বিশ্রী অবস্থা হ'ল আমার। ডিনার

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানলা দিয়ে একফালি আলো বারান্দায় গিয়ে পড়েছিল দেখলাম—আন্ তার দীর্ঘচ্ছন্দ, বিচলিত হাতখানা বাড়িয়ে বাবার হাতটা ধরে ফেল্ল। আমি সিরিলের কথা ভাবছিলাম! জ্যোৎস্না রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মাঝে ও' যদি আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিত; তা'হলে কত না শান্তি পেতাম! আদরে সোহাগে ও যদি আমার নিজের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিতে সাহায্য করত, তবে কি উপকারই না হ'ত। আন্ আর আমার বাবা চুপ করেই ছিলেন। তাঁদের সামনে সুখরজনী, আমার সামনে 'বার্গস'। কেঁদে মনটা হাল্কা করে নিতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু হায়! আন্‌কে শেষপর্যন্ত পরাস্ত করার দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল বলে ইতিমধ্যেই ওর জন্যে অনুশোচনায় মন ভরে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

এই মুহূর্ত থেকে পরের প্রতিটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। নিজের সম্বন্ধে, তথা অপর প্রতিটি ব্যক্তি সম্বন্ধে মন আমার সজাগ হয়ে উঠল। অচিন্তিত, অনায়াসলভ্য এক অহমিকায় আমার প্রকৃতি আচ্ছন্ন ছিল। চিরটা কাল ঐভাবে কেটেছে আমার। কিন্তু গত কয়দিনের ঘটনাবলী আমায় এত বিচলিত করেছে যে নিজেকে এখন তীব্র সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছি। ভেবে দেখলাম আন্ সম্বন্ধে আমার ধারণা কত ভ্রান্ত, কত নীচ; বাবার সঙ্গ থেকে তাকে বঞ্চিত করার চিন্তা কত অন্যায়। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এত নিষ্ঠুরতারই বা প্রয়োজন কি? যে ঘটনা ঘটে চলেছে, তাকে বিচার কবা কি আমার পক্ষে অন্যায়? জীবনে প্রথম আমার 'আমিত্বে' সংশয় জাগল; নিজের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত বিপরীতধর্মী দুটি 'আমি'কে আবিষ্কার করে বিস্ময়ে নির্বাক হলাম। ভাল ভাল যুক্তি খুঁজে আপন মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি, হঠাৎ ভেতর থেকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য 'আমি' সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে বুঝিয়ে দেয় যে আমার ধারণাগুলো বাহ্যত সত্য মনে হলেও, আসলে নিজের মনকে চোখ ঠারা বই কিছুই নয়।

মস্তিষ্কের এই নির্ভুল বিচারবুদ্ধি আমার জীবনের মস্ত একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ আপনমনে চিন্তা করে আবিষ্কার করলাম, আন্ আমার মধ্যে এই যে ভয় আর বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলেছে, তা কি একেবারে অমূলক, না আমি সত্যিই একটা বোকা স্বার্থপর, অপদার্থ মেয়ে, অসময়ে বড় হবার চেষ্টা করছি।

ইতিমধ্যে দিন দিন আমার শরীর খারাপ হতে লাগল। সমুদ্রের তীরে গিয়ে পড়ে পড়ে শুধু ঘুমোতাম। খাবার সময়ে একটিও কথা বলতাম না। শেষপর্যন্ত ওঁরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

আমি সমস্তক্ষণ আনের গতিবিধি লক্ষ্য করতাম, খাবার সময়ে ভাবতাম—ওর সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে বাবার প্রতি অগাধ ভালবাসা প্রকাশ পায়। এর চেয়ে বেশী ভালবাসা কি সম্ভব? ওর ম্লান হাসি দেখে বুঝতে পারি ও আমার সম্বন্ধে কত চিন্তিত। তারপরও কি ওর ওপর রাগ করে থাকা সম্ভব? কিন্তু পরক্ষণেই যখন ও এইভাবে কথা বলতে শুরু করত—"রেমঁদ আমরা প্যারিসে ফিরে গিয়ে.........", তখন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ওর অংশগ্রহণ এবং হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় মন আবার বিদ্রোহ করে উঠত। আবার ওকে সংসারী ও প্রাণহীন বলে মনে হ'ত। আমি বিচার করতে বসতাম ওর সঙ্গে আমাদের

তফাৎ অনেক। আমরা প্রাণের আবেগে চঞ্চল। আনের প্রকৃতি আবেগহীন, ঠাণ্ডা! প্রভুত্ব করাই যে ওর স্বভাব, অথচ বাবা আর আমি দুজনেই সুবিধাবাদী মানুষ, ও থাকে নিজেকে নিয়ে। বাইরের লোকের জন্য বড় মাথাব্যথা নেই ওর, এদিকে আমরা তো মানুষ ছাড়াই থাকতে পারিনা। আন্ গম্ভীর, আমাদের প্রকৃতি হাল্কা। আমরা দুজনে বেশ ছিলাম, নিঃশব্দে কখন ও আমাদের মাঝখানে ঢুকেছে। আমাদেরই চুল্লীতে আগুন পোহাবে, আর আমাদেরই প্রাণের উত্তাপ শুষে নেবে? এ যে অসহ্য! সুন্দর একটা সাপের মত ও আমাদের প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলবে।

তারপর আন্ যখন রুটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিত তখন সম্বিৎ ফিরে পেতাম। নিজেকে বোঝাতাম—"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এই তো তোমার সেই বন্ধু আন্, যার কাছে তুমি এত সাহায্য পেয়েছ, যার বুদ্ধির উপর এত আস্থা তোমার। দূরে সরে থাকাটা ওর স্বভাব, ভেবেচিন্তে নতুন কিছু করছে না। জীবনের অসংখ্য অপ্রিয় ব্যাপার থেকে বাঁচবার জন্য ওর এই সরে থাকার প্রচেষ্টা। আভিজাত্যের এ এক লক্ষণ। সুন্দর সাপের মত......"

ভাবতে ভাবতে লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম। ওর দিকে চেয়ে মনে মনে ক্ষমা চাইতাম। মাঝে মাঝে ও আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে অবাক্ হয়ে যেত। দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ত মুখে,

হঠাৎ কথা বলতে বলতে থেমে যেত। তারপর নিজে থেকেই যেন ওর দৃষ্টি বাবার মুখের উপর গিয়ে পড়ত কিন্তু সেখানে প্রশংসা বা গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পেত না। ধীরে ধীরে বাড়ির আবহাওয়া আমি অসহ্য করে তুললাম এবং সেই সঙ্গে নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা গেল বেড়ে। বাবার প্রকৃতিতে যতটা সম্ভব ততটুকুই তিনি আঘাত পেলেন অর্থাৎ বিশেষ কিছুই বুঝলেন না। আন্‌কে ভালবেসে, তার জন্যে অসম্ভব রকম গর্ব ও আনন্দে সমস্ত মন ভরিয়ে নিয়ে তাঁর দিন কাটছিল—জগতে আর কিছুই চোখে পড়ছিল না। যাইহোক্ সকালে সাঁতার কাটার পর সমুদ্রতীরে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এমন সময়ে বাবা কাছে এসে, খুব মন দিয়ে আমায় লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুভব করে, মিথ্যা খুশীর ভান করে, (ওটা ইদানিং আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল) আমার সঙ্গে সাঁতার কাটবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বাবা আমার মাথায় হাত রেখে চিন্তিত গলায় আন্‌কে ডাকলেন—"শোন, বাচ্চাটার দিকে লক্ষ্য কর ; দিন দিন কিরকম পাকিয়ে যাচ্ছে দেখেছ ? এই যদি পড়ার ফল হয়, তবে কাজ নেই অমন লেখাপড়া করে।"

বাবা ভাবলেন—ঐ যথেষ্ট ; দশ দিন আগে হলে, হ'তও তাই। কিন্তু এতদিনে আমি নানারকম জটীলতার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। বিকেলে পড়ার জন্যে যে সময়টুকু ধার্য

করা ছিল, তার জন্যে আমার আর দুশ্চিন্তা হত না, কারণ সেই 'বার্গস'র ব্যাপারের পর আমি আর বই খুলে দেখিনি। আন্ আমাদের কাছে সরে এল। আমি বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ওর পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলাম। ও আমার পাশে এসে বস্‌ল। আন্ বল্ল—"সত্যি তো, পড়াশোনা ওর সইছে না দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে শুধু পায়চারি না করে ও যদি সত্যি কিছুটা পড়ত......"

আমি মাথা ঘুরিয়ে ওঁদের দিকে তাকালাম। ও কি করে জান্‌ল যে আমি পড়ি না? ওকি হাত গুন্‌তে পারে? ওর পক্ষে সবই সম্ভব। আমার ভয় হ'ল। আমি প্রতিবাদ করলাম—"মোটেই আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি করি না!" বাবা জিজ্ঞেস্ করলেন—"ঐ ছেলেটির জন্যে কি তোমার মন কেমন করে?" "না" কথাটা সত্যি না হলেও, এটা ঠিক যে সিরিলের কথা ভাববার অবকাশ আমার ছিল না। বাবা জোর গলায় বল্লেন—"যাই হোক্ তোমার শরীর নিশ্চয়ই ভাল নেই। আন্ ভাল করে চেয়ে দেখ, মুরগীর ছানাকে ছাল ছাড়িয়ে রোদে শুকোতে দিলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে ওকে।" আন্ অনুনয় করল—"সেসিল্ ভাই, মনের জোর কর। খাটুনি কমিয়ে খাওয়া বাড়াও। পরীক্ষাটার সত্যি দরকার আছে।" আমি চিৎকার করে উঠ্‌লাম—"পরীক্ষা পাশ করতে আমার বয়ে গেছে। কেন তুমি বুঝ্‌ছ না যে পরীক্ষার জন্যে আমার এতটুকু

মাথা ব্যথা নেই!" নিরাশ হয়ে ওর দিকে করুণ চোখে চেয়ে আমি ওকে এইটাই বোঝাতে চাইলাম যে, আমার জীবনে এখন পরীক্ষার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। আমার অন্তরাত্মা চিৎকার করে ওর মুখ থেকে এই কথাই বের করে নিতে চেষ্টা করল—"বেশ তো! ব্যাপারটা খুলেই বলনা।" ও আমায় প্রশ্ন করে জেনে নিক্ না কেন আমার মনের কথাটা। তা'হলে সহজেই আমায় জয় করে নিতে পারবে, আমি ওর কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌ব আর আমার মনটাও হাল্কা হবে। নিবিষ্ট মনে আন্ আমায় দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ওর চোখের নীলিমা একাগ্রতায় ও ভর্ৎসনায় গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমায় প্রশ্ন করার কথা ওর মাথায় আসবে না। আমার মন হাল্কা করার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ ওর মনে হলেও ঐভাবে কৌতূহল নিবৃত্ত করা ওর ভদ্রতার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম যে, আমার মনের ভেতর এই ঝড়ের আভাস ও পায়নি। যদি ঘুণাক্ষরে ও আমার মনের কথা টের পায়, তবে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ও এক্ষুণি সরে দাঁড়াবে এবং সেই হবে আমার উপযুক্ত শাস্তি। সব জিনিষের উচিত মূল্য দেওয়াই আনের স্বভাব ; এবং এই জন্যেই আমি কোন দিন ওর সঙ্গে একমত হতে পারি না।

বালির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আমার মুখে তাপটুকু অনুভব করছিলাম। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, উত্তেজনায় আমি কাঁপতে শুরু করলাম। আমার ঘাড়ের ওপর ওর ঠাণ্ডা হাতটা স্থির

হয়ে চেপে রইল, আমার উত্তেজনা শান্ত হলে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বল্ল—"জীবনটাকে খুঁচিয়ে ঘা করো না। বরাবর তুমি কি সুন্দর হাসিখুশী, প্রাণখোলা, আপনভোলা মেয়ে ছিলে, হঠাৎ এরকম চাপা, গুম্‌রনোভাব কেন ? এ তোমায় সাজে না।" এর জবাবে আমি বল্লাম—"হ্যাঁ, আমি জানি, কি রকম হাল্কা, হাসিখুশী, স্বভাব ছিল আমার !" বাবা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন,—কোনদিন এ ধরনের আলোচনা উনি পছন্দ করতেন না। বাড়ি ফেরার সময়ে আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। বাবার হাত আমায় শক্তি দিত, সান্ত্বনা দিত। আমার প্রথম প্রণয়ের নৈরাশ্যের অশ্রু তাঁর ঐ হাত দিয়ে তিনি মুছে দিয়ে ছিলেন। শান্তিপূর্ণ আনন্দের সময়ে তাঁর ঐ হাত আমার হাতের ওপর এসে পড়ে আমার আনন্দের মাত্রা বাড়িয়েছে। আমাদের উচ্ছৃঙ্খল, মাত্রাহীন হৈ হুল্লোড়ের সময়ে ঐ হাত সন্তর্পণে আমার হাতে অল্প চাপ দিয়ে আমায় সজাগ করে দিয়েছে। গাড়ীর স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঐ হাতের কথা আমার মনে এল ; রাত্রের অন্ধকারে চাবি হাতে দরজার তালা হাত্‌ড়ে বেড়ানো মনে এল ; সুন্দরী রমণীর কাঁধের ওপর অথবা সিগ্রেট্ ধরা ঐ হাতের কথা আমার মনে এল। আজ এর সাধ্য কি আমায় উদ্ধার করে ? আমি গায়ের জোরে বাবার হাতে চাপ দিলাম। আমার দিকে ফিরে বাবা মুচ্‌কে হাস্‌লেন শুধু।

২

দিন চলে যায়। আমি ছটফটিয়ে ঘুরে মরি। আন্ আমাদের জীবন বিষময় করতে চলেছে এই আশঙ্কায় মনটা কিছুতেই হাল্কা করতে পারতাম না। ও হয়ত আমায় শান্তি দিতে পারত, সান্ত্বনা দিতে পারত, কিন্তু আমি তো তা চাইনি। পেছনে ফেলে আশা সুখের দিনগুলোর কথা ভেবে আগামী দিনের আশঙ্কায় মন আমার সব অসম্ভব কল্পনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। গরমটাও পড়ে ছিল প্রচণ্ড। জানালার পাখীগুলো নাবিয়ে দিয়ে ঘরখানাকে প্রায় অন্ধকার করেই রাখতাম। তবু বাতাসটা ভারী, স্যাঁৎস্যাঁতে হয়ে বুকের ওপর চেপে বস্ত। ছাদের দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতাম, আর বিছানার কোথায় একটু বেশী ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে, এরই তল্লাস করতাম। ঘুম আস্ত না। বিছানার পায়ের দিকটায় গ্রামোফোনটা টেনে নিয়ে একটার পর একটা রেকর্ড বাজাতাম। সুরমূর্ছনা বাদ দিয়ে শুধ্ ঢিমে তালের রেকর্ডগুলো পছন্দ হ'ত বেশী। প্রচুর সিগ্রেট্ খেতাম। আর মনের এই বিকৃত অবস্থা দিব্যি উপভোগ করতাম। কিন্তু মনকে এভাবে চোখ ঠেরে কোন লাভ হল না, মিথ্যে শোকের জ্বালায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

একদিন বিকেলে ঝি দরজায় ঘা দিয়ে কেমন যেন হেঁয়ালী করে বল্ল—"নীচে একজন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।" এক

নিমেষে আমার 'সিরিলে'র কথাই মনে হল। দৌড়ে নেবে এসে দেখি এল্সা দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড উৎসাহে ও আমায় অভ্যর্থনা করল। ওর দিকে চেয়ে, ওর নতুন পাওয়া সৌন্দর্যে চোখ আমার ঝল্সে গেল। শেষ অবধি ওর শরীরের সর্বত্র সমানভাবে চমৎকার সোনালী রং ফুটেছে। চমৎকার করে সেজে এসেছে ও, যেন যৌবনের প্রতিমূর্তি। এল্সা জবাবদিহি করল—"স্যুটকেশটা নিতে এলাম। 'জুয়ান' কয়েকটা জামা আমায় কিনে দিয়েছে বটে, তবু তাতে ঠিক কুলোয় না। আমার জিনিষগুলো দরকার।" জিজ্ঞেস্ করতে ইচ্ছে হ'ল—"এই 'জুয়ান'টি আবার কে?" কিন্তু চেপে গেলাম। এল্সাকে ফিরে আস্তে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল, যেন সঙ্গে করে বারবনিতাব জীবন, মদের গন্ধ, হোটেলের হৈ চৈ' আনন্দের স্বাদ বয়ে এনে আমার সাধের পুরোন দিনগুলোর স্মৃতি জাগিয়ে তুল্ছে। আমি যে ওকে দেখে কি পরিমাণ খুশী হয়েছি, সে কথা তাকে বল্লাম। সেও এটাই আমায় বুঝিয়ে দিল যে, আমাদের দু'জনের প্রবৃত্তির কোথায় যেন মিল ছিল, তাই কোনদিন আমাদের মধ্যে বিরোধ বাধেনি। মনে মনে শিউরে উঠ্লাম, আন্ আর বাবাকে এড়িয়ে সোজা আমার ঘরে নিয়ে এলাম। বাবার নাম করতে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। আমি অবাক্ হয়ে ভাবলাম 'জুয়ান' ওকে এত জিনিষপত্র কিনে দেওয়া সত্ত্বেও কি বাবার প্রতি ওর ভালবাসা মরেনি এখনও! সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভেবে নিলাম যে, তিন সপ্তাহ আগে হলে, ওর

মাথা নাড়াটুকু আমার চোখেই পড়ত না।..........রিভিয়েরার যত সব নাম করা বড় বড় জায়গায় কি দারুণ আনন্দে ওর দিন কেটেছে তারই বর্ণনা দিল আর আমি হাঁ করে শুনে গেলাম। ওর চেহারার এ হেন উন্নতি দেখে আমার চিন্তাধারায় আরও জট্ পাকিয়ে ফেল্লাম। শেষপর্যন্ত আমায় একেবারে চুপ করে থাক্‌তে দেখে বোধহয় ও থাম্‌ল।" ঘরের মধ্যে কয়েক পা পায়চারি করে, আমার দিকে না ফিরেই আল্‌তোভাবে জিজ্ঞেস করল—"রেমঁদ সুখী হয়েছে তো!" মুহূর্তের মধ্যে জবাবটা মাথায় জুগিয়ে গেল—"সুখী হয়েছেন বল্লে বেশী বলা হয়। সুখী হয়েছেন কিনা সেটুকু বুঝে ওঠার সময়টুকুও তো আন্ দেয় না তাঁকে। দারুণ চালাক মেয়ে তো।" এল্‌সা দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল—"সত্যি।" আমি বলে গেলাম—"তুমি ধারণাও করতে পারনা ও বাবাকে দিয়ে কি সব কাণ্ড করিয়ে নিচ্ছে! বাবাকে ও বিয়ে করে ছাড়্‌বে।" সন্ত্রস্ত মুখে এল্‌সা আমার দিকে ফিরল—"রেমঁদ বিয়ে করবে?" হঠাৎ একটা হাসির ধাক্কা কণ্ঠার কাছে আট্‌কে গেল। আমার হাত দুটো উত্তেজনায় কাঁপছিল। এল্‌সার মুখ দেখে মনে হ'ল আমি যেন ওকে প্রচণ্ড চড় মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছি। ওর মাথায় এই ধারণা ঢোকাতে চাইলাম না যে, বাবার বয়সে বারবণিতার পেছনে না ঘুরে, বিয়ে করে স্থিতি হয়ে বসাই শোভা পায় বেশী। আমি ঝুঁকে পড়ে ওর মনটাকে নাড়া দেবার জন্যে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লাম—"এল্‌সা,

এ কিছুতেই হয় না। এর মধ্যেই বাবার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। বুঝতেই পার কি রকম সব অসম্ভব ব্যাপার চলেছে।" মনে হ'ল আমার কথা যাদু করল ওকে, এল্‌সা বল্ল—"সত্যি ?" আমি বলে গেলাম—"তোমার জন্যে এতদিন হাঁ করে বসে আছি, কারণ আন্‌কে জব্দ করতে হলে তোমার চেয়ে উপযুক্ত পাত্রী আর তো চোখে পড়ে না। ওকে হারাতে হলে তোমাকেই চাই।" টোপ্‌ গিলেছে মনে হল, বল্ল—"কিন্তু বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, ওকে ভালবাসে বলেই তো!" আমি আরও চাপ দিলাম—"কিন্তু এল্‌সা, তুমি কি বল্‌তে চাও, বাবা যে তোমাকেই আসলে ভালবাসেন, সেকথা কি তোমার অজানা।" ওর চোখের পাতা নড়ে উঠ্‌ল, আমার কথায় যে আনন্দ, যে ভরসা পেল সেটুকু লুকোবার জন্যে পেছন ফিরে দাঁড়াল। আমায় যেন কে যাদু করেছে এম্‌নি হ'ল। কিন্তু ঠিক কি বল্‌তে হবে সেটা ততক্ষণে ভাবা হয়ে গেছে।

আমি বল্লাম—"বুঝতে পারছ না, আন্‌ ক্রমাগত বাবার কানের কাছে মন্ত্র পড়ছে—"বিয়ে করলে কত সুখ, কত শান্তি এই সব ; আর সেই ফাঁদে বাবার পা জড়িয়ে গেছে।" নিজের কথায় নিজেই বিস্মিত হ'লাম, কারণ ভাষাটা হয়ত খুবই রূঢ় শোনাল, কিন্তু আসলে ঐটাই আমার মনের কথা। "এলসা ওঁরা বিয়ে করলে আমাদের তিনজনেরই জীবন বরবাদ্‌ হয়ে যাবে। বাবাকে বাঁচাতেই হবে এল্‌সা। ও'র মত মস্ত শিশু

তো আর দেখিনি।" আবার কথাটায় জোর দিয়ে বল্লাম—"মস্ত শিশু।" একবার মনে হ'ল বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই এল্‌সার সুন্দর সবুজ চোখ দুটোয় করুণার ছায়া দেখে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম এইভাবে—"এল্‌সা তোমায় সাহায্য করতেই হবে। তোমার নিজের জন্যে, বাবার জন্যে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রেম গড়ে উঠেছিল তার জন্যে তোমায় আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে।" মনে মনে বল্লাম—"আর ঐ জনী চায়নাম্যান এর জন্যে।"

এল্‌সা বল্ল—"কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? এরতো কোন রাস্তা দেখি না।" আমি খুব করুণস্বরে জবাব দিলাম—"তোমার যদি মনে হয় কোন উপায় করা যায় না, তবে এ সব কথা ভুলে যাও।" এল্‌সা দাঁতে দাঁত ঘসে মন্তব্য করল—"কি হতভাগা মেয়ে রে বাবা!" আনের উদ্দেশ্যে এই গালাগালে যে তৃপ্তি পেলাম সেটুকু লুকোবার জন্যে পেছন ফিরে বল্লাম—"যা বলেছ!" এল্‌সার মুখ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠ্‌ল, নানারকম উপায় উদ্ভাবন করতে লাগ্‌ল। বল্ল—"আমায় গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নেওয়া হ'ল। এবার সেই দুঃসাহসিকাকে দেখিয়ে দেব এল্‌সা ম্যাকেনবারা কি করতে পারে আর না পারে। আর ভালবাসার কথা তো বলাই বাহুল্য! বাবা যে ওকে ভালবাসেন সে তো জানাই কথা। জুয়ানের সঙ্গে আছে, তাতে কি এসে যায়, বাবার কথা ভোলা সহজ নাকি? রেমঁদের সেবা এতদিন কে

করেছে, তাই বলে কি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে বস্‌তে হয়! একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড রে বাপু! এ কথা যে ভাবাও যায় না।” কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘট্‌তে শুরু করেছে; আমি ডাকলাম—“এল্‌সা, আপাততঃ একটা কাজ কর, সিরিলকে জিজ্ঞেস কর ওর মায়ের সঙ্গে তুমি ক'দিন থাক্‌তে পার কিনা? বল গিয়ে, যে তুমি একটু আশ্রয় চাও, আমি কাল ওর সঙ্গে দেখা করব, তারপর বিবেচনা করে কাজ করব।” দোরের কাছে গিয়ে, যেন বেশ মজার কথা, এইভাবে বল্লাম—“এল্‌সা তোমার ভবিষ্যৎ তোমার হাতে।” সেও গম্ভীরভাবে সায় দিল, ভাবখানা এই যে, পনের কুড়ি জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে ওর যে পনের কুড়িখানা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সামনে পড়ে আছে, এ যেন তার খেয়ালই নেই। অসংলগ্ন পা ফেলে চলে গেল। মনে মনে ভাবলাম, সপ্তাহ পেরোবার আগেই বাবা ওকে ফিরে পেতে চাইবেন।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। এমন সময়ে বাবা নিশ্চয়ই আনের বাহুবল্লরীর ছায়ায় নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন। আর সেও বোধহয় উৎফুল্ল পরিতৃপ্ত প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার গভীর আনন্দে সুখনিদ্রায় মগ্ন। হিতাহিত বিচারে কালক্ষয় না করে আমি একটার পর একটা কর্মপন্থা চিন্তা করে গেলাম। আমার ঘরের দরজা ও জানালার মধ্যবর্তী পরিসরটুকু পদচারণায় বিধ্বস্ত করে বেড়ালাম এবং মাঝে মাঝে বালুকাবেলার প্রান্তে

বিস্তীর্ণ, শান্ত জলরাশির দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। যাবতীয় সম্ভব অসম্ভব বিপদের আশঙ্কা, আমার স্বার্থসিদ্ধির আশা আমার মনে তোলপাড় করে উঠ্‌ল, এবং মন থেকে আমি দ্বিধার জড়টুকু পর্যন্ত সমূলে উৎপাটিত করে ফেল্লাম। নিজেকে আশাতীত বুদ্ধিমতী বলে মনে হ'ল এবং এল্‌সার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার সময়ে প্রথমে যেমন আত্মগ্লানি অনুভব করেছিলাম, সেটুকু ধুয়ে গিয়ে সে জায়গায় আপন শক্তির ওপর শ্রদ্ধা জাগ্‌ল।

বলাবাহুল্য সকলে মিলে যখন সমুদ্রে সাঁতার দিতে গেলাম, তখন আমার এই আত্মগরিমা ধুলোয় মিশে গেল। আনের দিকে চোখ পড়তে, নিজের দুষ্কৃতির জন্যে মনটা অনুশোচনায় ভরে গেল। আমি ওকে খুশী করার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। ওর থলিটা বয়ে নিয়ে চল্লাম, আর জল থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ের কাপড়টা নিয়ে দৌড়ে গেলাম। ভাল ভাল কথা বলে আমার জন্য ওর দুশ্চিন্তা শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। গত কয়দিনের মৌনব্রতের পর আমার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ও অবাক্ হয়ে গেল। বাবা খুশী হ'লেন। আন্ আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌ল, মনটা ওর হালকা হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম; এল্‌সার সঙ্গে ওর সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে কি ভাষা আমি ব্যবহার করেছি মনে করে দেখলাম। আশ্চর্য! আমার মুখ দিয়ে ঐ সব কথা কি করে বেরোল! আর এল্‌সার বোকামি কি করেই বা দিব্যি হজম করে গেছি! কাল এল্‌সা এলে আমার

ভুল স্বীকার করে ওকে বিদায় দেব। সব যেমন চলছিল তেমনি চলবে। সত্যি তো, পরীক্ষায় পাশ করার চেষ্টা কেনই বা আমি করব না! কলেজের একটা ডিগ্রী আমারই তো ভবিষ্যতে কাজ দেবে।

আন্‌কে জিজ্ঞেস করলাম—"তুমিই বলনা, কলেজে একটা ডিগ্রীর দরকার আছে কিনা।" একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিয়ে ও হো-হো করে হেসে উঠল। ওকে অমন খুশী হতে দেখে আমিও হাসিতে যোগ দিলাম। আন্‌ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—"বাবাঃ তোমায় বোঝা ভার!"

সে কথা আর বল্‌তে! আমার সব কাণ্ডকারখানা শুন্‌লে না জানি ও কি করবে! আমার বুদ্ধির বহরটুকু প্রমাণ করার জন্য একবার ইচ্ছে হ'ল, ওকে সব বলে দিই। মনে হ'ল বলি—"ভাবতে পার, আমি এল্‌সাকে উপদেশ দিতে যাচ্ছিলাম যে, ও যেন সিরিলের প্রেমে পড়েছে, এমন ভান করে। সিরিলের বাড়িতে অতিথি হয়ে, ওর সঙ্গে নৌকাতে, পাইন বনেতে সর্বত্র একত্র ঘুরে বেড়িয়ে প্রেমের অভিনয় করুক। এল্‌সা এবার খুব সুন্দরী হয়ে ফিরেছে। তোমার মত রূপ তার নেই বটে, তবে ওর যা' আছে তা পুরুষ মানুষের মাথা ঘোরাবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার বাবার পক্ষে বেশীদিন এ জিনিস বরদাস্ত করা সম্ভব হবে না। যে সুন্দরী এই সেদিন পর্যন্ত ওঁর রক্ষিতা হয়ে ওঁর বাড়িতে বাস করে গেছে, সেই মেয়ে তারই নাকের ডগায় বসে এত

শিল্পির তাঁর ছেলের বয়সী এক ছোক্‌রার সঙ্গে ঢলাঢলি করবে, এ তিনি সহ্য করবেন না কিছুতেই। জান, আন্—তোমাকে যদি বাবা ভালও বাসেন, তবু নিজের মনবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যেই, তিনি এর মধ্যেই আবার ওকে ফিরে চাইতে পারেন। হয়ত বাবার অত্যধিক অহঙ্কার কিম্বা নিজের ওপর আস্থার অভাবই এর জন্য দায়ী। এদিকে আমার কথায় এল্‌সা উঠ্‌বে আর বস্‌বে। এমন দিন নিশ্চয়ই আস্‌বে, যেদিন তিনি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য হবেন। তুমি কি তা সহ্য করবে? পুরুষ মানুষকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেয় যে মেয়েরা, তুমি তাদের দলের নও। তাই তুমি চলে যাবে নিশ্চয়ই। আর সেইটাই হ'ল আমার উদ্দেশ্য। জানি এটা কতদূর বোকামি! কিন্তু 'বার্গ্‌সঁ' এবং গরম এই দুইয়ে মিলে আমার মন তোমার ওপর বিগ্‌ড়ে দিয়েছে। এই অসম্ভব আজগুবি কথাটা তোমায় জানাতে আমার কেমন যেন ভয় করছিল। কলেজের একটা পরীক্ষার জন্য হয়ত তোমার সঙ্গে আমার চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হয়ে যেত, অথচ তুমি আমার এত দিনের বন্ধু, আমাদের পারিবারিক বন্ধু—তাছাড়া কলেজের ডিগ্রীর দরকার আছে বৈকি।" হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "না"।

আন্ চমকে প্রশ্ন করল—"কি, না? ডিগ্রীর দরকার আছে কিনা, এই তো!" বোধহয় সব কথা ওকে বলাও ঠিক হবে না, ও এসব বোঝে না। কতগুলো ব্যাপার আন্ মোটে ধরতে পারে

না, আমি বাবার পেছন পেছন দৌড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে কুস্তি খেলায় মেতে উঠ্‌লাম। অনেকদিন পরে বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করে আনন্দ পেলাম, কাল আমার ঘরখানা পাল্‌টে ফেল্‌ব। বইপত্তর নিয়ে চিলে কোঠায় গিয়ে উঠ্‌ব। কিন্তু বার্গ্‌সঁকে বাদ দেব। বাড়াবাড়ি করে কোন লাভ নেই। কল্পনা করে নিলাম, অক্টোবরের পরীক্ষায় আমি যেন ভাল করে উৎরে গেছি। বাবার বিস্মিত হাসি, আনের প্রশংসা ভরা দৃষ্টি, আমার ডিগ্রী, সব আমার চোখের ওপর ভেসে উঠ্‌ল। বোধহয় আনের মত আমিও বুদ্ধিমতী ও মার্জিত হয়ে সবার থেকে দূরে সরে যাব। হয়ত বা বিদুষী হবার জন্যেই আমার জন্ম। কারণ যে মতলব আমি বের করেছি, তা' ঘৃণ্য হলেও, যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে। আর এল্‌সা, তার কি হবে? আমি জানি ওর দম্ভকে, ওর নরম মনটাকে কি করে বাগ মানাতে হয়। সে তো শুধু স্যুটকেশটার জন্যেই এসেছিল, তবু কত সহজে ওকে আমার কথাটা বিশ্বাস করাতে পারলাম। মনে মনে খুব অহঙ্কার হ'ল, এই তো এল্‌সার দুর্বলতা আমি কেমন ধরে ফেলেছি। তার দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে খুব সাবধানে, কথা বেছে বেছে তাকে কায়দা করে এনেছি। জীবনে এই প্রথম একজনকে সঠিক চিন্‌তে পেরে তাকে নিজের কার্যসিদ্ধির কাজে নিয়োগ করতে পারার আনন্দে আমার মনে খুশীর ঢেউ উঠ্‌ল। এ এক নতুন

অভিজ্ঞতা। এতদিন পর্যন্ত আমার চপল স্বভাবের জন্য যদি কচিৎ কাউকে সঠিক ধরতে পেরে থাকি, তবে সেটা আকস্মিক বলেই জেনেছি। এখন হঠাৎ মানুষের মনের বিচিত্র কার্যকলাপ আবিষ্কার করে ফেল্লাম এবং সেই সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের অপার ক্ষমতা দেখে অবাক্ হ'লাম। একটা মিথ্যা ঘটনার ভেতর দিয়ে যে আমি এই সব তথ্য আবিষ্কার করলাম এই ভেবে দুঃখ হ'ল। একদিন আসবে, যেদিন আমি কারুর প্রেমে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে সন্তর্পণে তার হৃদয়ের সন্ধান করে মরব।

৩

পরদিন সকালে সিরিলের বাংলোর পথে যেতে যেতে নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় জাগলো মনে। আমার দেহ-মনের স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আনন্দে গত রাত্রে মদের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছিল, খুশীটা যেন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাবাকে জানালাম যেহেতু আমি ডিগ্রীর জন্যে প্রস্তুত হতে চলেছি, ভবিষ্যতে নাক উঁচু মানুষ ছাড়া মিশব না, দারুণ নাম ডাক হবে আমার, আর সেই সঙ্গে বেবাক্ বোকা হয়ে যাব। আমায় জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে বাবাকে বিজ্ঞাপন বিভাগের যাবতীয় নিন্দনীয় পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। হৈ হৈ করে, চেঁচামেচি করে আমরা অসম্ভব অসম্ভব সব উপায় কল্পনা করতে লাগলাম। আনের ঠোঁটের কোণে প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি। আমি যখন খুব বাড়াবাড়ি শুরু করলাম, আন্ একেবারে চুপ করে গেল। কিন্তু আমাদের আনন্দের জোয়ারে বাবার প্রাণে যে পুলকের ঢেউ উঠেছিল, তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা ও' করল না। শেষপর্যন্ত আমায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওঁরা শুতে গেলেন। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম, বল্লাম, তাঁদের বাদ দিয়ে আমি চল্‌ব কি করে? বাবা কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু আন্ যেন এবিষয়ে গভীর কিছু বল্‌বে বলে মনে হ'ল।

ও আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন বল্‌তে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে আমি ঘুমে অচৈতন্য। মাঝরাতে অসুস্থ বোধ করলাম এবং পরদিন সকালে উঠে এত খারাপ লাগ্‌ল যে, জীবনে আর কখনও কোন সকাল আমার কাছে এত তিক্ত, এত বিষাক্ত মনে হয় নি। পা দুটো তখনও টল্‌ছে, মন সম্পূর্ণ দমে গেছে তবু চল্লাম বনের পথে। সমুদ্র কিম্বা সদাচঞ্চল সামুদ্রিক পাখীগুলো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। সিরিল বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে দৌড়ে এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে, অস্ফুটস্বরে সোহাগ জানাল—"ওগো আমার প্রিয়! কি দুশ্চিন্তায় যে কেটেছে। কত যুগ যে তোমায় দেখিনি। আমি তো টেরও পাইনি কি করে তোমার দিন কেটেছে, কিম্বা ঐ স্ত্রীলোকটি তোমায় কত কষ্ট দিয়েছে। জীবনে কখনও এত দুঃখ পাইনি আমি। কতদিন যে সারা বিকেল ধরে ঐ খালটার কাছে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে কাটিয়েছি। তোমায় এত ভালবাসি তা যে নিজেও জানতাম না।"

আমি জবাব দিলাম—"আমিও না।" সত্যি কথা বল্‌তে ওর কথায় বুকের ভেতর টন্‌টন্ করে উঠ্‌ল, কিন্তু মরছি নিজের জ্বালায়, কাজেই মনের ভাব প্রকাশ করবার ভাষা পেলাম না। সিরিল আবার বল্ল—"ওঃ, কয়দিনে চেহারা কি হয়েছে তোমার! এখন থেকে তোমার দেখাশোনার ভার আমি নেব। কাউকে তোমায় কষ্ট দিতে দেবনা।" আমি বুঝলাম এল্‌সা তিল্‌কে তাল

করেছে, জিজ্ঞেস কল্লাম ওর মা এল্সা সম্বন্ধে কি ভাবছেন। সিরিল বল্ল—"আমি ওকে তোমার বন্ধু এক অনাথা মেয়ে বলে পরিচয় দিলাম। বাস্তবিক এল্সা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে; সে আমাদের ঐ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে সব খুলে বলেছে। কি আশ্চর্য! ঐরকম সুন্দর মার্জিত চেহারার পেছনে ঐরকম নীচ মনবৃত্তি লুকিয়ে আছে।" আমি দুর্বল প্রতিবাদ করতে গেলাম—"সামান্য ব্যাপারে হৈ হৈ করা এল্সার স্বভাব। কিন্তু ওকে আজ আমি বল্তে চাই—।" সিরিল বল্ল—"সেসিল তোমার কাছে আমারও একটা বক্তব্য আছে। তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।" মুহূর্তে ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। এক্ষুনি আমায় এর উপযুক্ত একটা জবাব দিতে হয়। হায়! হায়! এরকম ভাবে জড়িয়ে পড়ছি কেন? সিরিল আমার চুলের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে বল্ল—"আমি তোমায় ভালবাসি। আইন পড়া ছেড়ে, আমার মামা একটা ভাল চাকরি দেবেন বলেছেন—সেইটে নিয়ে নেব। আমার ছাব্বিশ বছর বয়স হ'ল, আর ছেলেমানুষটি নেই। এবিষয়ে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তুমি কি বল?" ধরা ছোঁয়া না দিয়ে একটা দারুণ কিছু বলতে চাইলাম। ভালবাসতাম ওকে ঠিকই, কিন্তু বিয়ে করব না। আসলে বিয়ের ওপর অভক্তি এসেছে। বড় ক্লান্ত আমি। আম্তা আম্তা করে বল্লাম—"এ একেবারে অসম্ভব। আমার বাবা—" সিরিল বাধা দিল—"তোমার বাবাকে আমি

ঠিক মত করিয়ে নেব।" আমি বল্লাম—"আন্ মত দেবেনা, ও' ভাবে আমি এখনও বড় হইনি। ও' যদি অমত করে বাবাও করবেন। সিরিল আমি বড় ক্লান্ত; আমার অন্তরে চাপা উচ্ছ্বাসগুলো বাইরের এই দেহটাকে ক্ষয় করে ফেলেছে। এই যে এল্‌সা!" ওর পরনে ছিল মাত্র অন্তর্বাস। স্বাস্থ্য ও প্রাণ শক্তির আধার যেন এই এল্‌সা। সিরিল ও এল্‌সা দুজনেই কেমন সুস্থ, সবল, প্রাণবন্ত, ওদের সামনে নিজেকে বড় বেশী রিক্ত মনে হচ্ছিল। আমি যেন সদ্য কোন বন্দী, আমাকে নিয়ে এল্‌সা এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করল। আমি বসে পড়লাম। ও জিজ্ঞেস করল—"রেমঁদ কেমন আছে? সে কি জানে যে আমি এখানে?"

অতীতের দুঃখের স্মৃতি ওর মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে, এখন ওর মন আশায় ভরপুর। আমি ওকে কি করে বোঝাই যে, বাবা ওর অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে বসে আছেন। সিরিলকেই বা কি করে বোঝাই যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাইনা। চোখ বুঁজে বসে রইলাম। সিরিল কফি আন্‌তে ভেতরে গেল। এল্‌সা ব'কে যেতে লাগ্‌ল। ও নিশ্চয় আমাকে অত্যন্ত বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী বলে ধরে নিয়েছিল। কড়া সুগন্ধি কফি আর সূর্যের উত্তাপ ধীরে ধীরে আমার অবসাদ কাটিয়ে দিল। এল্‌সা বল্ল— "আমি ভেবে কূল-কিনারা পাই না।" সিরিল বল্ল—"উপায় আবার কি? বৃদ্ধ একেবারে ভেড়া বেনে গেছেন।" আমি

বল্লাম—“উপায় একটা আছে। কেবল তোমাদের কল্পনাশক্তির অভাব।” আমার মুখের কথা খসার অপেক্ষায় দুজনকে হাঁ করে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠ্‌ল। ওরা আমার চেয়ে দশ বছরের বড়, কিন্তু মাথা বলে কিছুই নেই ওদের। আমি খুব বিজ্ঞের মত বল্লাম—“এ হ’ল মনস্তত্বের ব্যাপার। আমি ওদের আমার মতলবটা বলে দিলাম। গতকাল আমার নিজের মনে যে আপত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, ওরাও দেখি সেগুলোর কথাই ভাব্‌ছে। ওদের আপত্তি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে আমার যেন উৎসাহের অন্ত রইল না। আমার মতলবে কাজ করলে, কার্যোদ্ধার হবেই এই ধারণা ওদের মনে বদ্ধমূল করাতে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যখন বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এভাবে কাজ করা ভিন্ন কোন উপায় নেই, তখন যুক্তিগুলোর জোড় হারিয়ে গিয়েছিল। সিরিল বল্ল—“এরকম ধাপ্পাবাজি আমার মোটেই পছন্দ নয়, তবে এ না করলে তুমি যদি আমায় বিয়ে না কর, তবে তোমার কথাই থাক্।” আমি বল্লাম—“অবশ্য আমার বিয়েতে আনের কোন হাত নেই।” এলসা বল্ল—“তুমি নিশ্চয় বুঝেছ যে, ও তোমাদের সঙ্গে থাকলে, তোমার বর ঐ জুটিয়ে দেবে।” কথাটা বোধহয় সত্যি। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম, আমার বিশ বছরের জন্মদিনে আন্ আমার সঙ্গে, আমারই মত ডিগ্রিধারী এক বিশ্বস্ত, কর্তব্যনিষ্ঠ যুবকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে, কারণ সে ছেলের ভবিষ্যৎ

উজ্জ্বল হবার সম্ভাবনা আছে। বোধহয় এই সিরিলের মতই আর একজন। আমি হাস্‌তে শুরু করলাম। সিরিল বল্ল—"লক্ষ্মীটি হেসোনা। বল, তুমি যখন এলসার সঙ্গে আমায় প্রেমের অভিনয় করতে দেখবে, তখন তোমার মন ঈর্ষায় ভরে উঠবে না! কি করে তুমি এর চিন্তামাত্র বরদাস্ত করতে পারলে? তুমি কি আমায় ভালবাস?" ও নীচু গলায় কথা বলছিল। এলসা বুদ্ধি করে দূরে সরে গিয়ে আমাদের কথা কইবার সুযোগ করে দিল। আমি সিরিলের রোদে রাঙ্গা মুখে, গভীর চোখে প্রেমের ছায়া দেখলাম। ওর টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটো নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। ক্রমেই নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। আরও কাছে এসে আমায় নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট চেপে ধরল আমার ঠোঁটের ওপর। আমি ওর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ওর প্রেমের উত্তপ্ত পরশ উপভোগ করলাম। এক মিনিট চুপ করে থেকে আবার ওর ঠোঁট দুটোর ভেতর দিয়ে মুক্তি দিল ওর রুদ্ধ প্রেমকে। এর পর আমরা পরস্পরকে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে ফেল্লাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ডিগ্রী নেওয়ার চেয়ে, তপ্ত সূর্য্যালোকে যুবাপুরুষকে চুমো খাওয়া আমার পক্ষে অনেক বেশী সহজ। নিশ্বাস নেবার জন্যে ওর হাত ছাড়িয়ে চলে এলাম। ও বল্ল—"সেসিল, আমাদের সারা জীবন একসঙ্গে কাটাতেই হবে। ইতিমধ্যে এলসার সঙ্গে তোমার সেই খেলাটা খেলে নিই কি বল?" একবার মনে হ'ল আমার

হিসেবের ভুল হচ্ছে না তো! যেহেতু উপায়টা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, যে কোন মুহূর্তে এটা থামিয়ে দেওয়া আমারই হাতে। সুদর্শন দস্যুসর্দারের মত ঠোঁটের পাশটা অল্প তুলে, মৃদু হেসে সিরিল বল্ল—"তোমার মাথায় এতও আসে?" ঠিক এইভাবে আমার বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে আমার সমস্ত ঘটনাটা চালু করে দিলাম। এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিন যদি কেবলমাত্র অলস মস্তিষ্ক; সূর্যের দাহন জ্বালায় এবং সিরিলের চুম্বনের মাদকতায় উত্তেজিত না হয়ে, বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের ভাব দ্বারা পরিচালিত হতাম, তবে হয়ত আত্মগ্লানি কম হ'ত।

যাই হোক্ ঘণ্টা খানেক পরে আমার দুষ্কর্মের সাথাদের যখন ছেড়ে এলাম, তখন মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তবু একটা ভরসা ছিল মনের কোণে যে, আনের প্রতি বাবার এই নিবিড় প্রেম হয়ত আমার মতলব ভেস্তে দেবে। উপরন্তু সিরিল বা এল্‌সা আমার বুদ্ধি ছাড়া চলতে পারেনা। নেহাৎই যদি দেখি বাবা আমার ফাঁদে পা বাড়িয়েছেন, তা'হলে আর না এগোলেই চল্‌বে। কিন্তু তবু মতলব হাসিল করতে গিয়ে, আমার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কোন গলদ আছে কিনা, সেটা যাচাই হয়ে যাবে। ওই আগ্রহও আমার এই দুষ্কর্মের আরও একটি কারণ। আরও একটা কথা, সিরিল আমায় ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। এই চিন্তা আমার মাথায় রিম্‌ঝিম তুলেছিল। ঠিক দু'বছর পরে ও' যদি আমায় চায়, তবে ওকেই আমি বিয়ে

করব। সিরিলের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা, ওর পাশে শোয়া, অহোরাত্র ও'র সঙ্গ—এত সব সুখ যে আমার কল্পনাতীত। প্রতি রবিবারে আমরা দুজনে বাবা আর আনের সঙ্গে খেতে যাব। কখনও বা সিরিলের মাকেও সঙ্গে নেব। পারিবারিক জীবনের চূড়ান্ত করে তুল্‌ব।

বাড়ি পৌঁছে দেখি আন্ বারান্দা পার হয়ে সমুদ্রের দিকে আস্‌ছে, বাবা বোধহয় আগেই গেছেন। গতরাত্রে আমি খুব মদ খেয়েছিলাম, সেই কথা ভেবেই বোধহয় আন্ একটু দুষ্টুমী করে হাস্‌ল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে ও আমায় কি বল্‌তে যাচ্ছিল। সে কথার জবাব দিল না, বল্ল—"চটে যাবে তুমি"। ঠিক সেই সময়ে বাবা জল থেকে উঠে আস্‌ছিলেন—কি সুন্দর চওড়া, পেশীবহুল গড়ন! আমি আনের সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলাম, আন্ ধীরে ধীরে জল থেকে মাথাটা উঁচু করে, চুল না ভিজিয়ে স্নান করত। স্নান সেরে আমাকে মাঝে নিয়ে বাবা আর আন্ বালির ওপর শুয়ে পড়লেন, বড় শান্তি পেলাম যেন!

ঠিক এই সময়ে পুরোদমে পাল তুলে দিয়ে একটা নৌকা এদিকে আসছিল, বাবার চোখেই প্রথম পড়ল। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"তাইতো সিরিল বেচারা আর থাক্‌তে পারল না। আন্ এবারকার মত ওকে ক্ষমা করে নিই, কি বল? ছেলেটা কিন্তু বড় ভাল।"

বিপদের গন্ধ পেলাম যেন! মাথা উঁচু করে দেখ্‌লাম। বাবা বল্লেন—"কিন্তু ওর মতলবটা কি? এদিকে আস্‌ছে না কেন? ওমা! ওর সঙ্গে আবার কে?" এতক্ষণে আন্‌ মাথা ফিরিয়ে দেখ্‌ল। নৌকোটা আমাদের খালে না ঢুকে সোজা নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সিরিলকে চেনা কষ্টকর হ'ল না। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, ও যেন এক্ষুনি এখান থেকে সরে যায়। কিন্তু বাবার বিস্মিত চিৎকার কানে এল—"কিন্তু ও কে? এল্‌সা না? ও কি করছে এখানে?" আনের দিকে ফিরে বল্লেন—"দেখেছ, মেয়েটা কি শয়তান? এর মধ্যে গো-বেচারা ছেলেটাকে হাত করে, বুড়ির ঘাড়ে গিয়ে চেপেছে।" কিন্তু আনের কানে কথা পৌঁছল না। ও' আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। ওকে দেখে আমি লজ্জায় বালির মধ্যে মুখ গুঁজে দিলাম। আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বল্ল—"আমার দিকে ফেরো। তুমি কি এরজন্যে আমায় দায়ী করছ?" আমি চোখ খুলে দেখি ওর সারামুখে অনুনয় মাখানো রয়েছে। আর একদিন, যেদিন ওর হাত থেকে উদ্ধারের আশায় বাবার কাছে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে ছিলাম, সে দিনের মত ঠিক—আজও সে আমাকে বুদ্ধিমতী, কুসুমকোমল এক বালিকা বলে মেনে নিল। বাবা তখনও নৌকোটার দিকে চেয়েছিলেন। আন্‌ ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্ল—"বাছা আমার! ছোট্ট সেসিল্‌ আমার! এখন আমার ভয় করছে,

আমার জন্যেই আজ এই কাণ্ডটা হ'ল। বোধহয় তোমার ওপর অমন না করলেই ভাল হত! তোমায় দুঃখ দিতে আমি চাইনি, বিশ্বাস কর।" আস্তে আস্তে আমার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। আমি চুপ করে পড়ে রইলাম। ভাটার টানে ঢেউগুলো যেমন শরীরের নীচ থেকে সরসর করে বালি টেনে নেয়, ঠিক তেমনি একটা শিহরণ আমার সারা দেহে বয়ে গেল। ঐ মুহূর্তে সম্পূর্ণ পরাজয়ের গ্লানিটুকু মেনে নেবার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠ্‌ল। এর তুলনায় আমার প্রচণ্ড রাগ, সমস্ত কামনা, আবেগ তুচ্ছ মনে হ'ল। আমার সমস্ত মতলবে জলাঞ্জলি দিয়ে, বাকী জীবনটা নিজেকে ওর হাতে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার একান্ত ইচ্ছা রয়ে গেল মনের মধ্যে। আর কখনও নিজেকে এত নিঃস্ব, এত রিক্ত মনে হয়নি। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। মনে হ'ল হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল বুঝি।"

———

৪

এ পর্যন্ত বিস্ময় ভিন্ন বাবা আর কোন রকম ভাব প্রকাশ করেন নি। বাড়ি ফিরে এসে ঝিয়ের মুখে শুনলেন—এল্‌সা তার স্থটকেশটা নিতে এসেছিল। ঝি কিন্তু আমার সঙ্গে তার সাক্ষাতের উল্লেখ পর্যন্ত করল না। পল্লীরমণীর স্বভাব-কুতূহলী মন দিয়ে সে এই কয় মাসে এ বাড়ির বিভিন্ন পটপরিবর্তন, বিশেষতঃ শয়নকক্ষের দৃশ্যান্তরগুলি বেশ উপভোগ করছিল।

আমার ভাঙা মন জোড়া দিতে বাবা আর আন্‌ এমন সব কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করলেন যে, প্রথম প্রথম আমার অসহ্য মনে হত। কিন্তু শিগ্গীরই আমি মন স্থির করে ফেললাম কারণ যদিও সবটাই আমারই মন্ত্রণায় ঘটছিল, তবু সিরিলের হাত ধরে এল্‌সাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে বড় কষ্ট হ'ল। সিরিলের সঙ্গে নৌকাচড়া আমার বন্ধ হয়ে গেছে অথচ বাতাসে চুল এলিয়ে এল্‌সা দিব্যি ওর সঙ্গে নৌকা চড়ে বেড়াত। প্রায়ই পথে ঘাটে, গ্রামের মধ্যে, পাইন বনে ওদের একসঙ্গে বেড়াতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আন্‌ একবার আমার মুখখানা দেখে নিয়ে কোন একটা বিষয়ের অবতারণা করে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করত, আর আমার

কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে চাইত। ও যে কত নরম স্বভাবের মেয়ে, সে কথা বলেছি আগে। তার এই করুণা বুদ্ধিজাত না শুধু আত্ম-সংযমের ফল, তা আমি জানি না, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওর। সিরিলকে নিয়ে সত্যি যদি আমার মনোকষ্টের সূত্রপাত হত, তাহলেও বোধ করি ওর সান্ত্বনায় শান্তি পেতাম।

যেহেতু বাবার মধ্যে ঈর্ষার কোন লক্ষণ দেখ্‌তে পেলাম না, সেই জন্যেই বিশেষ কিছু উদ্বিগ্ন না হয়ে যেমন চল্‌ছিল, তেমনি চল্‌তে দিলাম। এদিকে আনের প্রতি বাবার প্রেমের গভীরতা সম্বন্ধে যতই নিঃসন্দেহ হ'লাম, ততই আমার এত সাধের ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে যাওয়ার চিন্তায় বিরক্তি বাড়ল। একদিন পোষ্ট আফিসে যাবার পথে এল্‌সার সঙ্গে দেখা হ'ল। ও যেন আমাদের দেখ্‌তেই পায়নি, এমনি ভাব দেখাল। আর বাবা অবাক্ হয়ে শিষ্‌ দিয়ে উঠ্‌লেন—যেন এই প্রথম ওকে দেখলেন উনি। বাবা উল্লসিত হয়ে বল্লেন—"দেখ দেখ, রূপ যেন উথলে উঠ্‌ছে।"

আমি জবাব দিলাম—"প্রেমটা ওর ধাতে সয় বোঝা যাচ্ছে।"

বাবা আরও অবাক্ হয়ে বল্লেন—"বটে বটে, তুমি তো দেখ্‌ছি দিব্যি সহজ করে নিয়েছ ব্যাপারটাকে।" আমি জবাব দিলাম—"অগত্যা! সিরিল আর এল্‌সা যে এক বয়সী। বোধ

হয় এরকম হওয়াই স্বাভাবিক!” ক্ষেপে গিয়ে বাবা বল্লেন—“আন্ যদি না এসে পৌঁছত আমি দেখিয়ে দিতাম কি স্বাভাবিক, আর কি নয়? তুমি কি মনে কর এল্‌সার সম্বন্ধে আমার যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাক্‌ত, তবে ঐ দুধের ছোঁড়াটাকে ওর গায়ে হাত দিতে দিতাম!”

আমি আরও গম্ভীর হয়ে গেলাম—“যাই বল, বয়সের একটা দাম আছে তো?”

অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করে বাবা কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে নিলেন। ফেরার পথে আমি ওঁর অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করলাম। বাবা বোধহয় ভাবছিলেন যে, সিরিল এল্‌সা দুজনেরই বয়স কম; আর নিজের সমবয়সী আন্‌কে বিয়ে করে তিনি তরুণদের দলচ্যুত হয়ে পড়বেন। তখনকার মত বিজয়িনীর গর্বে মনটা আমার নেচে উঠ্‌ল, কিন্তু আনের চোখের পাশে বয়সের সূক্ষ্ম রেখাগুলোর দিকে চোখ পড়তে মরমে মরে গেলাম। আমার খামখেয়ালী মনের নির্দেশ মেনে চলা খুব সহজ, কিন্তু প্রত্যেক বারই পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছি।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সিরিল আর এল্‌সা এদিকের কোন খবর পেত না, কাজেই রোজই আমার অপেক্ষা করে থাক্‌ত। পাছে আরও নতুন কিছু করতে লোভ হয়, সেই ভয়ে ওদের কাছে যেতে পারতাম না। রোজ বিকেলে মনস্থির করে পড়ব ভেবে নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিতাম, কিন্তু কাজ কিছুই

এগোত না। যোগতন্ত্রের ওপর একখানা বই পেয়ে নিত্য নানারকম যোগ অভ্যাস করতে শুরু করে দিলাম। পাছে আনের কানে যায়, তাই গলাটা খুব নীচু করে নিজের মনে হাস্‌তাম। ওকে বল্লাম, পড়ায় দারুণ চাপ দিয়েছি। আন্‌কে বোঝালাম যে, প্রেমের এই পরাজয়ের গ্লানি আমায় ডিগ্রী পাবার উদ্দীপনা যোগাচ্ছে। ভাব্‌লাম ওর চোখে বড় হবার এই এক-মাত্র উপায়। এমন কি খাবার টেবিলে বসে "কান্ট" আওড়াতে শুনে বাবা পর্যন্ত কেমন যেন দমে গেলেন।

একদিন বিকেলে হিন্দুদের মত গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে, যোগাসন করে ব'সে, আয়নার মধ্যে নিজের ছায়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, যৌগিক নিদ্রার অভ্যাস করছি, এমন সময়ে কে যেন দরজায় টোকা দিল। ঝি এসেছে ভেবে ভেতরে আস্‌তে বল্লাম। কিন্তু ঝি নয়, আন্ এল। কয়েক মুহূর্ত দোর গোড়ায় অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হেসে বল্ল,—"এ কি ধরনের খেলা হচ্ছে?" আমি জবাব দিলাম—"একে বলে যোগশাস্ত্র। এটা মোটেই খেলা নয়, এ হ'ল হিন্দু দর্শনশাস্ত্র।"

টেবিলের কাছে গিয়ে বইটা তুলে নিল। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। একশ' পৃষ্ঠায় বইটা খোলা ছিল, তার আগের সব কটা পাতায় আমার হাতের আবোল তাবোল লেখা ছড়ানো ছিল, যথা—"দারুণ শক্ত" কিম্বা "প্রাণান্তকর" ইত্যাদি। আন্ বল্ল—"তুমি যে তোমার বিবেক মেনে চল, সেটা বেশ' বোঝা

যাচ্ছে। তোমার সেই 'পাসকাল' এর ওপর প্রবন্ধখানা কৈ? দেখছি না তো এখানে?" খাবার সময়ে 'পাসকাল' এর ওপর ছু'চার লাইন আওড়ে আমি ওঁদের জানিয়েছিলাম যে, 'পাস-কালে'র ওপর একখানা প্রবন্ধ রচনা করছি। আসলে কিন্তু এক লাইনও লেখা হয়নি। উত্তরের অপেক্ষা করে যখন দেখ্‌ল আমি চুপ করে আছি, তখন ও ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বল্ল—"এখানে বসে তুমি কাজ না করে যত খুশী বোকামি করতে পার, সেটা তোমার কথা, কিন্তু তোমার বাবা কিম্বা আমাকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কর কেন? বল্‌তে কি হঠাৎ তোমার এই সুবুদ্ধি দেখে কেমন যেন খট্‌কাই লাগ্‌ছিল।"

তোয়ালের মধ্যে আমাকে একেবারে নির্বাক্‌ করে দিয়ে ও আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল। 'ধাপ্পা' কথাটা কেন যে ব্যবহার করল, বুঝ্‌তে পারলাম না। 'পাস্‌কালে'র কথা বল্‌তে আমার মজা লাগে, তাছাড়া প্রবন্ধের কথা শুনে ও খুশী হবে তাই তো বলা, এখন আমার ওপর উল্টো চাপ! এতদিনে ওর ধৈর্য আমার সহ্য হয়ে এসেছিল; কিন্তু ওর অবজ্ঞা আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্‌ল। তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা পাজামা আর পুরোন সার্ট গায়ে দিয়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দৌড়েই চল্লাম; রাগ আর লজ্জা ছুয়ে মিলে আমায় যেন পাগল করে দিল। সিরিলের বাড়ি পর্যন্ত নাগাড় দৌড়ে একেবারে ওর দরজায় এসে নিঃশ্বাস ফেল্লাম।

দুপুরের রোদে বাড়িটাকে প্রকাণ্ড, নিস্তব্ধ রহস্যপুরী বলে মনে হ'ল। আমরা যেদিন ওদের বাড়ি চা খেতে গিয়েছিলাম, সেদিন ও' আমাকে ওর ঘরটা দেখিয়েছিল। আমি চুপিসারে ওর ঘরের দিকে এগোলাম। দরজাটা খুল্‌তে চোখে পড়ল, সিরিল হাতের ওপর মাথা রেখে বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

আমি একদৃষ্টে ও'র দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই প্রথম মনে হ'ল ও' কত অসহায়, কত মিষ্টি। আস্তে নাম ধরে ডাকলাম—"সিরিল।" চোখ মেলে তড়াক্‌ করে উঠে বস্‌ল। "একি সেসিল! তুমি? কি ব্যাপার!" আমি ওকে কথা কইতে বারণ করলাম। যদি ওর মা এসে আমায় ঘরের মধ্যে দেখে ফেলেন? উনি ভাব্‌বেন, যে কেউ ভাব্‌তে পারে যে……হঠাৎ আমার ভয় ধরে গেল, দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সিরিল যেন আর্তনাদ করে উঠ্‌ল—"যেওনা, যেওনা সেসিল, এদিকে এস।" চট্‌ করে আমার কব্জিটা ধরে ফেলে হাস্‌তে লাগ্‌ল—আমি নড়তে পারলাম না। হঠাৎ ফিরে দেখি ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আমার নিজের অবস্থাও তথৈবচ। ও আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে বুকে চেপে ধরে বিছানায় টেনে নিয়ে গেল। 'এ যে হতেই হবে', মনের বিচলিত অবস্থায় ভাবছিলাম শুধু—কোনো না কোন সময়ে—'এযে হতেই হবে।' কারণ প্রেমের এই তো স্বাভাবিক গতি—ভয়, তার

থেকে জাগে কামনা, করুণা, রাগ, প্রচণ্ড উদ্বেগ, সবশেষে আনন্দ। সিরিলকে ধন্যবাদ দিই যে ও'র ভদ্র স্বভাবের গুণে আমি একসঙ্গে এত সব আবিষ্কার করে ফেল্লাম।

ঘণ্টাখানেক ওর সঙ্গে ছিলাম। পরিতৃপ্ত কিন্তু বিচলিত বোধ করলাম। প্রেম কথাটা আক্ছার শুনেছি, সে সম্বন্ধে বোকার মত কত বড় বড় কথাই না কত সময়ে আওড়েছি; এরকম তো সব অনভিজ্ঞ ছেলে মেয়েই বলে থাকে। কিন্তু এখন মনে হ'ল ভবিষ্যতে প্রেম সম্বন্ধে আর কখনও ও রকম নিষ্ঠুর হৃদয়হীনভাবে আলোচনা করতে পারব না। আমার পাশে শুয়ে সিরিল অনর্গল আমাদের বিয়ে, ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা করে যাচ্ছিল। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ও' অস্বস্তি বোধ করল। আমি উঠে বসে ওর দিকে তাকিয়ে বল্লাম,—"প্রিয় আমার।" ওর কাঁধে চুমু খেয়ে আবার বল্লাম,—"প্রাণাধিক সিরিল আমার!"

ঠিক ধরতে পারলাম না আমার মনের অবস্থাকে প্রেম বলা চলে কিনা। চিরকেলে চঞ্চল মেয়ে আমি; এবিষয়ে নিজেকে ঠকাতে ইচ্ছে হ'ল না। কিন্তু ঐ সময়টুকু ওকে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে হ'ল। ওর জন্যে আমি হয়ত প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারতাম। আসবার সময়ে সিরিল আমায় জিজ্ঞেস করল, আমি রাগ করেছি কিনা! আমি শুধু হাসলাম। যে আজ আমায় এত আনন্দ দিল, তার ওপর রাগ করা অসম্ভব কথা!

আমি পাইন বনের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলাম। সিরিলকে আমার সঙ্গে আসতে বারণ করেছিলাম—হয়ত মুস্কিলে পড়ে যাব। তাছাড়া আমার মুখ দেখে বা চলার ভঙ্গী দেখে হয়ত ওঁরা ধরে ফেল্‌বেন।

আন্ বাড়ির সামনে আরাম চেয়ারে বসে কি যেন পড়ছিল। এতক্ষণ কোথায় ছিলাম, এ সম্বন্ধে বেশ একটা গল্প এঁকে নিয়ে ছিলাম, কিন্তু তার দরকার হ'ল না। ও কখনও কোন প্রশ্ন করত না। আমার এতক্ষণে মনে পড়ল ও'র সঙ্গে আজ ঝগড়া হয়ে গেছে—ধপ্ করে ওর পাশে বসে পড়লাম। অস্বাভাবিক নিঃশ্বাসের গতিবিধি, আঙ্গুলের কাঁপুনি, সিরিলের চিন্তা সব নিয়ে চুপ্ করে বসে রইলাম।

টেবিল থেকে একটা সিগ্রেট্ তুলে নিয়ে ধরাবার জন্যে একটা দেশলাই ঘস্‌লাম, সেটা নিভে গেল। কাঁপা হাতে আবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাওয়া না থাকা সত্ত্বেও দেশলাই জ্বল্‌ল না। যেহেতু আন্ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, সেই জন্যে মনে হ'ল—বার, বার, তিনবার—এবারে জ্বালাতেই হবে দেশলাইটা। হঠাৎ চারপাশ থেকে সব যেন ছায়ার মত মিলিয়ে গেল। রইল শুধু আমার আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা দেশলাইএর কাঠি আর বাক্সটা; আমায় ভেদ করে আনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নিজের হৃদ্‌স্পন্দন নিজের কানেই শুন্‌তে পেলাম। গায়ের জোরে বাক্সের গায়ে কাঠিটা ঘসে দিলাম, কিন্তু যেই

নীচু হয়ে ধরাতে যাব, সিগ্রেট্ লেগে আগুনটা দপ্ করে নিভে গেল। দেশলাইএর বাক্সটা হাত থেকে পড়ে গেল। আনের দৃষ্টি আমার অন্তরাত্মা বিদ্ধ করে রয়েছে। অসহ্য উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। তারপর আন্ আমার থুৎনীর নীচে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরল। পাছে আমার চোখের ভাষা ধরে ফেলে সেই ভয়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলাম। চোখের কোল ছাপিয়ে কান্না আসছিল—অবসাদ, আনন্দ, লজ্জা সব মিলিয়ে সে অশ্রুর সূচনা! গালে টোকা দিয়ে আদর করে আমায় ছেড়ে দিল, মনে হ'ল আর কোন কথা বল্‌বে না বলে মনস্থির করেছে। তারপর একটা সিগ্রেট্ ধরিয়ে আমার মুখে গুঁজে দিয়ে, বইখানা তুলে নিল।

বোধহয় এই ঘটনাটার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত ছিল। এখনও যখনই আমি মাঝে মাঝে দেশলাই হাতড়ে বেড়াই, তখনই এই ঘটনাটা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই মুহূর্তের কথা, যখন আমার হাত দুটো আর আমার ছিল না, আনের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আজও যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে; আমার চারপাশের শূন্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

৫

এই ঘটনার পরিণতি এখানেই নয়। সংযত, আত্মসচেতন লোকেদের মত অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ না করাই ছিল আনের প্রকৃতি। বারান্দায় ও আমাকে যখন কিছু না বলে ছেড়ে দিল, সেটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ হয়েছিল। আন্ নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করেছিল, তাছাড়া আমায় তখন জিজ্ঞেস করলে আমি সবই বলে ফেলতাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার কোমলস্বভাব আর চরিত্রগত ঔদাসীন্যই জয়ী হ'ল। আমার দুর্বলতা সহ্য করা বা অগ্রাহ্য করা দুই-ই তারপক্ষে কষ্টকর ছিল। কেবলমাত্র কর্তব্যবোধ তাকে আমার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল। বাবাকে বিয়ে করা মানে আংশিকভাবে আমারও দায়িত্ব নেওয়া; সে এই কথাই মনে করত। যদি মাঝে মাঝে তার ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখতাম, কিম্বা ব্যবহারে এমন কিছু পেতাম, যা আমাকে নাড়া দিতে পারে না, তাহ'লে হয়ত আমার প্রত্যেকটি আচরণে তার অসন্তোষ সহ্য করা আমার পক্ষে সহজ হ'ত। অন্যায় সংশোধন যদি কর্তব্য মনে না করা যায়, তবে অনেক অন্যায় সহ্য হয়ে আসে। হয়ত কয়েকমাসের মধ্যেই ও আমার সম্বন্ধে মাথা ঘামান ছেড়ে দিত এবং আমার সম্বন্ধে এই উদাসীন মনোভাবের সঙ্গে তার অগাধ স্নেহ মিশে সম্পর্ক সহজ হয়ে আসত।

কিন্তু যেহেতু তার ধারণা ছিল যে, আমায় সংশোধন করার বয়স তখনও যায়নি সেইজন্যেই তার প্রখর কর্তব্যজ্ঞান এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। যথেষ্ট জেদী মেয়ে হলেও আমাকে গড়ে নেওয়া চল্‌ত। এই জন্যেই বোধহয় আমার বিষয়ে অমন হতাশ হয়ে, নিজের মনের বিরক্তিটুকু পর্যন্ত আমার কাছ থেকে গোপন রাখতে চেষ্টা করত না। কিছুদিন পরে ডিনারের সময়ে আমার ছুটির পড়া নিয়ে কথা উঠ্‌ল। আমি একটু বাড়াবাড়ি করায় বাবা পর্যন্ত বিরক্ত হলেন। আলোচনার সময়ে আন্‌ একবারও চড়া কথা বলেনি, অথচ খাবার পরে সেই আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখে গেল। প্রথমে আমি দারুণ ঘাবড়ে গেলাম। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে পালাবার পথ আছে কিনা দেখে নিলাম. কিন্তু ওদিকে বিশেষ সুবিধে হ'ল না। ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে রাগ শান্ত হয়ে এল। জীবনে এই প্রথম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পরিচয় হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। বিছানায় চুপ করে শুয়ে শুয়ে প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করতে লাগলাম। ঘটনার তুলনায় আমার নৃশংসতার মাত্রা বহুদূর ছাড়িয়ে গেল। বাস্তবিক বার বার দরজা খুল্‌তে গিয়ে বাধা পেয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ছ'টার সময়ে বাবা এসে আমায় খুলে দিলেন। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে মৃদু হেসে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাবা

নিঃশব্দে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"আমায় কিছু বল্‌বে ?" আমি বল্লাম—"কি বিষয়ে ? তুমি তো জান, আমাদের এত কথা বলার আছে—শেষ অবধি যার কোন মানে হয় না।" বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—"কিন্তু শোন, ভবিষ্যতে আনের সঙ্গে তোমার ব্যবহার আরও ভদ্র করতে হবে। আরও সংযত হতে হবে।" বাবার কথায় আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। আমি আনের সঙ্গে সংযত ব্যবহার করব, ব্যাপারটাতো উল্টোই হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ আমাকে আনের ঘাড়ে নয়, আন্‌কে (তাঁর নিজের প্রয়োজনবোধে) যেন আমার ওপর চাপান হচ্ছে। যাক তবে এখনও আশা আছে। অমি বল্লাম,—"আমার মাথার ঠিক ছিল না—ওর কাছে আমি ক্ষমা চাইব।" বাবা জিজ্ঞেস্ করলেন—"মাগো, তোমার মনে কোন দুঃখ নেই তো ?"

আমি বল্লাম,—"মোটেই না। আর যদিই বা ওর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লাগে, আমি না হয় একটু আগেই বিয়ে করে ফেল্‌ব—ব্যাস্ সব ল্যাঠা চুকে যাবে।" আমি জান্‌তাম আমার কথাগুলো বাবার মরমে গিয়ে আঘাত দেবে। বাবা বল্লেন—"সে ভাবে ভাববার কোন কারণ নেই। তুমি তো আর স্নো হোয়াইট্ নও। তোমায় আমি কিছুতেই এত শিগ্‌গির শ্বশুরবাড়ি যেতে দেব না। মাত্র বছর দুই আমরা একসঙ্গে আছি।" বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা তাঁর পক্ষেও যেমন, আমার পক্ষেও তেমনি অসহ্য। আমি যেন দেখতে পেলাম—যে, বাবার কাঁধে

মাথা রেখে আমি আমাদের দুজনের উৎসবমুখর দিনগুলোর কথা মনে করে কাঁদছি। কিন্তু তবু কিছুতেই আমার ষড়যন্ত্রের কথা তাঁকে বলা চল্‌বে না। শুধু বল্লাম,—"জানই তো বাড়াবাড়ি করা আমার স্বভাব। দু' দিক থেকে অল্পবিস্তর ছাড়তে পারলেই আমি আর আন্ দিব্যি চালিয়ে নেব।" বাবা জবাব দিলেন,—"নিশ্চয়, তা আর বল্‌তে?" সেই মুহূর্তে আমার মত করেই বোধহয় বাবা ভাব্‌ছিলেন যে, ছাড়তে যা হবে তা' আমাকেই হবে। তাই আমি বল্লাম,—"জান বাবা, আমি বুঝতে পারি, আন্ সর্বদা ঠিকই বলে। ও'র জীবনধারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, অনেক বেশী গভীর।"

বাবা বাধা দিতে চেষ্টা করতে আমি থামিয়ে দিলাম—"মাস-খানেক, মাস দুয়েকের মধ্যে আমিও আনের মত করে ভাব্‌তে শিখ্‌ব, তখন আমাদের মধ্যে আর এই বোকার মত কথা কাটাকাটি হবে না। শুধু কিছুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।" বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কি? তবে কি তিনি তাঁর একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারিয়ে অতীতের সুখ-স্মৃতিতে জলাঞ্জলি দিতে বসেছেন? ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করলেন—"নাও, আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না। আমি জানি আমার সঙ্গে তুমি যে জীবন কাটিয়েছ, তা হয়ত তোমার বয়সের পক্ষে শোভন নয়; তবু সেইদিনগুলো মোটেই কিছু এমন একঘেঁয়ে, নীরস লাগেনি। যাই বল, গত দু' বছরের

মধ্যে কখনও কি আমাদের তেমন খারাপ লেগেছে? জীবন সম্বন্ধে আনের ধারণা আমাদের সঙ্গে মেলে না বলে এখনই অত করে ভাব্‌বার কিছু নেই।" আমি আরও জোর গলায় বল্লাম—"ভুল কথা! আমি যা' বলেছি সেটুকু তো কিছুই নয়, আমাদের আগেকার মত থাকা আর চল্‌বে না।" আমরা দুজনে একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেবে এলাম। বাবা শুধু বল্লেন—"হয়ত তাই, হয়ত তাই!" কিছুমাত্র ঘাব্‌ড়ে না গিয়ে আমি সোজা আনের কাছে ক্ষমা চাইলাম। সে বল্ল—যে, এর কোন দরকার ছিল না। ওর কথায় মনটা হাল্কা হয়ে গেল।

আগের থেকে ঠিক করা ছিল, পাইন বনে সিরিলের সঙ্গে দেখা করে এরপর কি করতে হবে বলে দিলাম। বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মিশিয়ে সে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুন্‌ল। তারপর আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে আমি বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারলাম না। ওকে ছেড়ে আস্‌তে কষ্ট হচ্ছে দেখে নিজের মনে নিজেই অবাক্ হ'লাম। আমাকে জয় করার রাস্তাই যদি ওর সমস্যা হয়েছিল সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ওর অঙ্গের স্পর্শে অঙ্গ আমার রোমাঞ্চিত হয়। গভীর ভালবেসে তাকে চুমু খেলাম। সারা সন্ধ্যে যাতে আমায় ভুল্‌তে না পারে, সমস্ত রাত আমায় স্বপ্ন দেখে, সেইজন্য ওর ঠোঁটটা কাম্‌ড়ে নিতে ইচ্ছে হ'ল। ওর চঞ্চল উচ্ছ্বাস ও সোহাগস্পর্শ থেকে সারারাত বঞ্চিত হবার চিন্তা অসহ্য মনে হ'ল।

৬

পরদিন সকালে বাবাকে টেনে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম, ছোট ছোট কথা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে করতে এগিয়ে চল্লাম। পাইন বনের পথ দিয়ে বাংলোতে ফিরে আস্বার প্রস্তাব আমিই করেছিলাম। ঠিক দশটা বাজে, সময়টা আগে থেকে ঠিক করা ছিল। পা' না ছড়ে যায় এইভাবে কাঁটা সরাতে সরাতে বাবার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। মাঝপথে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে বুঝলাম, বাবা ওদের দেখ্‌তে পেয়েছেন। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। ঐতো পাইন বনের কাঁটার ওপর দিব্যি শুয়ে সিরিল আর এল্‌সা। ঘুমে যেন অচৈতন্য। যদিও সবই আমার পরামর্শ মতই এগোচ্ছে, আর আমি জানি যে, ওরা মোটেই পরস্পরের প্রেমে পড়েনি, তবু তুজনেই এত সুন্দর ও সুস্থ যে ঐভাবে দেখে আমারই হিংসা হ'ল। লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম যে, বাবার মুখখানা সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে। বাবার হাতটা ধরে নিয়ে বল্লাম,—"চল, ওদের জাগিয়ে কোন লাভ নেই।" এল্‌সার গায়ের রং সোনার মত ঝক্‌ঝকে, যৌবনের অপূর্ব পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, লাল চুল আর ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি দেখে আবার একবার বাবা ফিরে চাইলেন। মনে হ'ল সত্যি যেন কোন বনদেবী শেষপর্যন্ত প্রেমের জালে ধরা পড়েছে। অস্ফুটে

বাবা গালাগাল দিয়ে উঠ্লেন,—"নষ্ট মেয়ে মানুষ কোথাকার।" আমি প্রতিবাদ জানালাম—"কেন ও কথা বল্‌ছ, ওতো স্বাধীন মেয়ে, বাধাটা ওর কোথায় বল ?" বাবা বল্লেন—"সে কথা নয়। সিরিলের আলিঙ্গনে ওকে ধরা দিতে দেখে তোমার মনে পুলক উথ্‌লে উঠ্‌ল নাকি ?" আমি জবাব দিলাম—"ওকে আমি আর ভালই বাসি না।" অহেতুক জোর গলায় বাবা বল্লেন—"আমিই কি এল্‌সার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি নাকি ? তবু কি খারাপ লাগে না ? যাই বল, একদিন তো সে আমার সঙ্গে—হ্যাঁ—আমার সঙ্গেই শুয়েছে। এইজন্যে তো এত বিশ্রী লাগে।"

কতদূর খারাপ লাগ্‌তে পারে আর না পারে, সে কথা আমার পক্ষে জানা কি সম্ভব ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বাবার এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই ইচ্ছে হচ্ছে এক দৌড়ে গিয়ে দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে, নিজেরটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসেন। নিজেরই তো সম্পত্তি ছিল একদিন। আমি খোঁচা দিলাম—"ধর যদি আন্ তোমার কথা শুনে ফেলে—তখন ?" বাবা ধম্‌কে উঠ্‌লেন,—"কি বল্‌তে চাও জানি, ও এসব বোঝে না। শুন্‌লে মর্মাহত হবে—এও ঠিক, কিন্তু সেই তো ওর স্বভাব ! কিন্তু তোমার কি হল ? তুমিও কি আমায় ভুল বুঝ্‌ছ নাকি আজকাল। অবাক্ হ'চ্ছে নাকি আমার ব্যবহারে ?"

কত সহজে বাবাকে আমার পথে চালিয়ে নিয়ে এলাম। ওঁর স্বরূপটা এত প্রকটভাবে জান্‌তে পেরে আতঙ্কে শিউরে

উঠ্‌লাম। মুখে বল্লাম—"মোটেই আমি কিছু অবাক্‌ হইনি। কিন্তু ঘটনাটা বোঝবার চেষ্টা কর। এল্‌সার স্মরণ শক্তি কম। সিরিলকে ওর চোখে লেগেছে, ব্যাস্‌ ঢুকে গেল, তোমার কথা মাথা থেকে বেবাক্‌ উড়ে গেছে। কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে কি ব্যবহার করেছ ভেবে দেখ একবার। এর কি কোন ক্ষমা আছে?" বাবা বল্‌তে শুরু করেও মাঝ পথে থেমে গেলেন,—"আমি যদি ওকে চাই—"আমি জোর গলায় বল্লাম—"তোমার সে গুঁড়ে বালি।" যেন এল্‌সাকে ফিরে পাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করা আমার পক্ষে কত সহজ। অনেকটা ঠাণ্ডা গলায় এবার বল্লেন—"যাক্‌ এসব কথা ভেবে কোন লাভ নেই।" আমি কাঁধে অবজ্ঞাসূচক ঝাঁকি দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম—কি আর করবে বল? বয়স হয়েছে, এখন আর মেয়েদের পেছনে ছুটো-ছুটি করা তোমার পোষায় না। মুখে বল্লাম—"সত্যি কোন লাভ নেই।" বাড়ি পৌছন পর্যন্ত আর একটাও কথা কইলেন না। বাড়ি এসে আন্‌কে বুকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। সে বেচারী অবাক্‌ হ'ল, কিন্তু খুশী হয়েই তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

বেলা ত্নটোর সময়ে হাল্কা শীষের শব্দে আমি সমুদ্রতীরে সিরিলের কাছে চলে এলাম। নৌকোয় চড়ে মাঝ সমুদ্রে পাড়ী দিলাম। কিছু দেখা গেল না, প্রচণ্ড রোদে কেউ ঘর ছেড়ে

বেরোয়নি। তীর থেকে বেশ কিছুদূর গিয়ে পালটা নাবিয়ে নিল। এতক্ষণ আমরা কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করিনি। শেষে সিরিল বল্ল—"আজ সকালে—"

বাধা দিলাম আমি—"কথা থাক্, ওগো, এই মুহূর্তে কোন কথা বোল না।" আমায় আস্তে করে নৌকোর ভেতর ঠেলে দিল। জলের মাথায় মাথায়, ঘর্মাক্ত কলেবরে, বিচিত্র অবস্থায় ব্যগ্র, ব্যাকুল তুটি প্রাণ পরস্পরকে কাছে পেল। আমাদের প্রেম-তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে নৌকার দোতুল্ দোল্ মিলে এক হয়ে গেল। মাথার ওপর মার্ত্তণ্ডদেব, কানের কাছে সোহাগকুজন! সূর্য যেন খণ্ডে খণ্ডে আমার ওপর আছড়ে পড়ল। আমি কোথায়! সমুদ্রের কোলে! অনন্ত কালের বক্ষে, প্রেমের অতল গভীরে! সমস্ত শক্তি জড়ো করে ডাক্‌লাম—"সিরিল, সিরিল!" উত্তরের প্রয়োজন ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে নোনা জলের ছল্‌কানি কানে এল। সূর্যালোকে শুয়ে শুয়ে, অবাধ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসলাম তুজনে। তপনদেব ও বরুণদেবের সাহচর্যে, বনোচ্ছ্বাস আর প্রেমের জোয়ারে মেতে উঠ্‌লাম। অবাক্ হয়ে ভাবি সেই দিন কি আর ফিরে পাব আমরা? আমার পক্ষে তুঃখ ও তুশ্চিন্তার নিম্নগামী স্রোতের ব্যতিক্রম হিসাবে এই আনন্দের মাত্রা অত্যধিক মনে হয়েছিল।

বাস্তবিক দৈহিক সুখের চেয়েও প্রেমের সুখ-চিন্তায় যেন

আমি এক অপূর্ব মানসিক তৃপ্তি পেয়েছিলাম। "করা" এই বাস্তব সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দটির সঙ্গে "প্রেম" এর কবিত্বপূর্ণ কাল্পনিক তাৎপর্য মিলিয়ে এক বিচিত্র মায়া আমায় অভিভূত করেছিল। আগে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে, অথবা বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিয়েই "প্রেম" কথাটি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। এখন আমার মনে সংশয় উপস্থিত হ'ল।

আন্ কেমন যেন অশোভন রকম অন্তরঙ্গ সুরে হাস্‌ল, বাবা আর আমি দুজনেই মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকালাম। আন্ ঐ হাসির মধ্যে দিয়ে নিজেকে কতটা ব্যক্ত করে ফেলে, সে কথা শুন্‌লে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে চাইত না। বাবার সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু...... মনটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঐ সব আবোল তাবোল চিন্তা থেকে সরিয়ে নিলাম। এজাতীয় অপ্রীতিকর ভাবনা আমার অসহ্য লাগত। চোখের পলক ফেলতে না ফেল্‌তে সময় কেটে গেল। প্রেমের ভেতর দিয়ে আমি আর এক জগতে প্রবেশ করলাম। কেমন যেন নেশার ঘোর লাগল, অথচ পূর্ণ সজাগ, শান্ত, পরিতৃপ্ত হারানো আমাকে ফিরে পেলাম। সিরিল জিজ্ঞেস্ করত আমার ভয় করে কিনা? উত্তরে আমি যে নিজেকে ওর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, একথা শুনে সুখী হ'ত। আমি জান্‌তাম আমার যদি সন্তান সম্ভাবনা হয়, তবে তার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে সে প্রস্তুত। কোনরকম দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া আমার স্বভাব-

বিরুদ্ধ, কিন্তু সিরিল এবিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। আমার এই শীর্ণ দেহের জন্যে কোন আশঙ্কাই ছিলনা। এই প্রথম আমি আমার অপরিণত, রুক্ষ এই শরীরের জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

এদিকে এল্‌সার পক্ষে আর বেশীদিন ধৈর্য রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ও আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করে তুলছিল। আমিও সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি কখন বুঝি ওদের সঙ্গে ধরা পড়ে যাই। সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র সে বাবার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌ত; নিজের মনকে বোঝাত যে আমার বাবা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে রয়েছেন। যে মেয়ে প্রেম আর জীবিকা আলাদা করে দেখতে শেখেনি, তাকে সামান্য একটু চাউনি, বা অঙ্গভঙ্গী দেখে রোমাঞ্চিত হতে দেখে আমি অবাক্ হয়ে যেতাম, কারণ তার কাছে এসবের বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকার তো কথা নয়। সে বোধহয় মনে করত যে, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের চরম অভিনয় করে চলেছে।

এদিকে এল্‌সার চিন্তায় বাবার মন ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে এলেও, আন্‌কে দেখে মনে হ'তনা যে ওর চোখে বাবার কোন ভাবান্তর ধরা পড়েছে। আনের প্রতি বাবার ব্যবহারে আদর সোহাগের মাত্রা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। আমি আতঙ্কিত হয়ে বুঝলাম এ তাঁর মনের গোপনে অপরাধবোধের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা

প্যারিসে ফিরে যাব। এর মধ্যে কোন দুর্ঘটনা যেন না ঘটে। এল্‌সা আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবে; বাবা আর আন্‌ বিয়ে করে সুখী হবেন; অবশ্য এর মধ্যে বাবার যদি মতিভ্রম না হয়। প্যারিসেও আমি সিরিলকে পাব, এখানেও যেমন আন্‌ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখ্‌তে পারেনি, সেখানেও পারবে না। খোলা জানালা দিয়ে প্যারিসের লালেতে নীলেতে ছোপান, বিচিত্র আকাশ চোখে পড়বে, জানালার পাশে ছোট্ট বিছানায় আমি আর সিরিল পাশাপাশি শুয়ে পায়রার বকম্‌ বকম্‌ ডাক শুন্‌ব। বেশ লাগে ভাব্‌তে।

৭

কিছুদিন পরে বাবার এক বন্ধু আমাদের সেন্ট রাফেলের হোটেলে নেমন্তন্ন করে বসলেন। এই নিরালার বাইরে ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ ফুর্তি করার আশায় বাবা সুখী হলেন। আমাদের খবরটুকু শোনাবার জন্যে তাঁর যেন আর তর সইছিল না। আমি এল্‌সা আর সিরিলকে বল্লাম যে, সাতটার সময়ে আমরা "বার-দু-সলৈই" এ থাক্‌ব, ইচ্ছে করলে ওরাও সেখানে যেতে পারে। এল্‌সা বল্ল বাবার ঐ বন্ধুটির সঙ্গে ওর বিশেষ পরিচয় আছে, সেইজন্য আগ্রহটা ওর দিক থেকেই বেশী মনে হ'ল। গোলমালের সম্ভাবনা বুঝে আমি ওকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। ছেলেমানুষের মত সরলভাবে বল্ল—"চার্ল্‌স্ ওয়েব তো আমার প্রেমে পাগল। ও যদি আমায় দেখে তাহ'লে এমন করবে যে, আমাকে ফিরে পাবার জন্যে রেমদের জেদ্ চড়ে যাবে। 'সেন্ট রাফেল' সম্বন্ধে সিরিলের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে আমার কাছাকাছি থাক্‌তে পারলেই সে সুখী। মনে মনে ভারী অহঙ্কার হ'ল।

ছ'টার সময়ে আমরা আনের গাড়ী করে রওনা হ'লাম। গাড়ীটা ছিল বিরাট "আমেরিকান্ কনভার্টেবল।" আসলে ওর

বিজ্ঞাপনের কাজে সুবিধে হবে বলেই এ গাড়ীটা কিনেছিল; ওর নিজের রুচী সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার কিন্তু এর চক্‌চকে আস্‌বাবগুলো খুব ভাল লাগত। আরও একটা কারণে গাড়ীটার ওপর আমার ঝোঁক ছিল। এতে আমরা তিনজনেই সামনের সিটে বস্‌তে পারতাম। বাবা আর আনের মাঝে বসে তাদের সঙ্গে সমান তাল রেখে চল্‌তে পারলে আমি যত খুশী হ'তাম, তত আর কিছুতে নয়। তাঁদের সঙ্গে এভাবে মরেও সুখ। আন্ ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে বস্‌ল। এ যেন আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবারের পূর্বাভাস। 'কান্‌স্' এর সেই ঘটনার পর আজ প্রথম আমি আবার ওর গাড়ীতে চড়লাম।

"বার-ডু-সলৈই" এ চার্লস্ ওয়েব আর তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল। চার্লস্ রঙ্গমঞ্চের বিজ্ঞাপন বিভাগের মানুষ। স্ত্রী তার সমস্ত টাকা অল্পবয়সী ছেলেদের আপ্যায়নে খরচ করত। টাকাই ছিল তার সমস্যা। একূল, ওকূল—দুকূল বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তার মাথায় ঢুক্‌ত না, কাজেই অস্থিরতা তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। অনেককাল সে এল্‌সার পেছনে ঘুরেছে; আর এল্‌সাও তার সঙ্গে মিলেছিল ভাল, কারণ রূপ ছাড়া পুরুষ মানুষকে ধরে রাখার মত আর কোন গুণই তার ছিল না। ওয়েবের স্ত্রী ছিল শয়তান মেয়ে মানুষ। আন্ ওকে আগে কখনও দেখেনি। লক্ষ্য করলাম ওকে দেখা মাত্র আনের মুখে উদ্ধত ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠ্‌ল। সাধারণতঃ সমাজে এই

ছিল তার মুখোশ। চার্লস অনর্গল বক্‌বক্‌ করে গেল, আর মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে আন্‌কে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। ও হয়ত অবাক্‌ হ'ল এই ভেবে যে, আনের মত মেয়ে কি করে বিখ্যাত রমণীরঞ্জন রেঁমদ্‌ এবং তার মেয়ের সঙ্গে এসে জুটেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাবা একটু সামনে ঝুঁকে হঠাৎ বলে ফেল্লেন—"ওহে একটা খবর আছে। আন্‌ আর আমি ৫ই অক্টোবর বিয়ে করছি।" ওয়েব একবার বাবাকে আর একবার আন্‌কে ভাল করে দেখে নিয়ে বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। বাবার সম্বন্ধে ওর স্ত্রীর দুর্বলতা ছিল, সে কোন রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। একটু হক্‌চকিয়ে থেমে ওয়েব চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"অভিনন্দন! শত শত অভিনন্দন! কি দারুণ ব্যাপার! হে সুন্দরী! আপনি জানেন না এর গুরুত্ব কতখানি। সত্যি ধন্যা আপনি! এই বয়, এদিকে এস, আজকের উৎসবের রাত্রি আমরা পালন করবই।"

আন্‌ শান্ত, মিষ্টি করে হাস্‌ল। তারপর দেখি ওয়েবের মুখের ওপর হঠাৎ কে যেন একমুঠো আলো ছড়িয়ে দিল। ফিরে তাকাবার দরকার হ'লনা। ওয়েব চিৎকার করে উঠ্‌ল—"এল্‌সা! হা ভগবান! এলসা ম্যাকেনবারা যে? ও আমায় দেখেনি এখনও। রেঁমদ্‌ দেখেছ, মেয়েটা কি সুন্দর হয়ে উঠেছে!" বাবার গলায় সমঝদারী সুর—"সে কথা আর বল্‌তে?" হঠাৎ বাবার খেয়াল হ'ল—এ কি অশোভন ব্যাপার করে ফেল্লেন, মুখখানা পলকে ম্লান হয়ে গেল।

বাবার গলায় ঐ সম্মোহিত সুর আনের কানে গিয়ে বাজ্‌ল। চট্‌ করে আমার দিকে ফিরে কি যেন বল্‌তে চাইল। আমি তার আগেই ফিস্‌ফিস্‌ করে যেন খুব গোপন কথা বল্‌ছি, এইভাবে বাবাকে শুনিয়েই বল্লাম—"আন্‌ তুমি যে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলে! ঐ দেখ ঐ লোকটি তোমার দিক থেকে চোখই ফেরাতে পাচ্ছে না।"

বাবা ফিরে দেখ্‌তে চেষ্টা করলেন লোকটিকে। আনের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বল্লেন—"এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।"

ওয়েবগিন্নির গলায় বিদ্রূপের সুর—"দেখ, দেখ এদের দুটিকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে। চার্লস্‌, এসময়ে ওদের বিরক্ত করা আমাদের উচিত হয়নি, বরং বাচ্চা সেসিল্‌কে একা ডাকলেই ভাল হ'ত।" দ্বিধাহীন গলায় আমি জবাব দিলাম—"বাচ্চা সেসিল মোটেই একা আস্‌ত না।"

ওয়েবগিন্নি—"কেন? কোন জেলের প্রেমে পড়েছ নাকি?" একবার আমায় এক বাস ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে দেখে অবধি ওর ধারণা হয়েছিল যে, সমাজে আমার জাত মারা গেছে। খুব যেন মজার ব্যাপার এইভাবে আমি জবাব দিলাম—"নিশ্চয়ই।"

ওয়েবগিন্নি—"তুমি কি প্রায়ই তার সঙ্গে মাছ ধরতে যাও নাকি?" আমি উত্তর দিলাম—"মাছ আমি চিনিনা, কিন্তু জাল

পাত্তে আপত্তি কি?" মুহূর্তে সবাই চুপ হয়ে গেলেন। আমার হুলটুকু সবার কানেই গিয়ে বাজল। আন্ শান্ত গলায় ডাক্‌ল—"রেমঁদ্—বয়কে একটা ষ্ট্র দিয়ে যেতে বল, কমলার সরবৎটা খেয়ে নিই।" চার্লস্ ওয়েব হৈ হৈ করে সকলকে আর একপ্রস্থ মদ খাওয়াবার জন্যে সাধ্য-সাধনা করতে লাগ্ল। বাবা হঠাৎ গেলাসের ভেতর এত মনযোগ দিয়ে পানীয়টা লক্ষ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যে আমি বুঝতে পারলাম, হাসিতে তার দম্ আট্‌কে আসছে। আন্ আমায় ইশারায় ক্ষান্ত হতে অনুরোধ জানাল। যাইহোক্ আমাদের মধ্যে কোন খটাখটি নেই—এটাই প্রমাণ করতে আমরা ডিনার একসঙ্গেই খাব স্থির হ'ল। ডিনারের সময়ে প্রচুর মদ খেলাম। আন্ উদ্বিগ্নভাবে বাবাকে লক্ষ্য করছিল, আমার দিকে ওর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি আমায় আঘাত দিল। ভুলে থাকার জন্যে আরও বেশী করে মদ খেলাম। যতবারই ওয়েবগিন্নি আমায় খোঁচা দিতে চেষ্টা করে, ততবারই আমি তাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওয়েবগিন্নি ক্ষেপে গিয়ে আমায় সোজাসুজি আক্রমণ শুরু করল। আন্ আমায় ইশারায় চুপ করতে বল্ল। লোকের মাঝে অসভ্যতা করার প্রতি তার আতঙ্ক ছিল। এদিকে ওয়েব্-গিন্নি দিব্যি এক পর্ব গড়ে তুলেছিল। এ আমার নতুন নয়। আমাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা প্রায়ই এধরনের কাণ্ড করত, তাই আমি বিশেষ বিচলিত হ'লাম না। ডিনারের পর আমরা অস্থ

একটা বার-এ ঢুকলাম। একটু পরে এল্‌সা আর সিরিলও সেখানে এল। এল্‌সা দারুণ চেঁচিয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ঢুক্‌ল, বেচারা সিরিল ওর পেছনে ছিল। মনে হ'ল এল্‌সা যেন বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুল্‌ছে, কিন্তু ওর রূপ সব দোষ ঢেকে দিল।

চার্লস্‌ বাবাকে জিজ্ঞেস করল,—"মেয়েটার পেছনে ঐ গাধাটা কে? বয়স অল্প বলেই মনে হচ্ছে।" ওর গিন্নি ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে বল্ল—"প্রেম ওকে নবযৌবন দিয়েছে।" বাবা জবাব দিলেন—"ভুলেও তা' মনে করো না, প্রেমট্রেম্‌ নয়, শুধু সাময়িক ব্যাপার আর কি!"

আমি আন্‌কে লক্ষ্য করছিলাম। যেমনভাবে আর সব মেয়েদের, এমনকি তার নিজের তৈরী জামা কাপড় পরে যে সব মেয়েরা নিজেদের প্রদর্শন করে দূর থেকে যেমন শান্ত বিচারকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, এল্‌সাকেও সেইভাবে দেখ্‌ছিল আন্‌। হিংসা বা বিদ্বেষের লেশমাত্র ওর মুখের ভাবে প্রকাশ পায়নি; শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল। আসলে সে যে এল্‌সা থেকে অনেক বেশী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কাজেই হিংসের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। মাতাল অবস্থায় আমি ওকে সেই কথাই বল্লাম, ও অবাক্‌ হয়ে আমার দিকে চাইল,—"তুমি কি সত্যি মনে কর আমি এল্‌সার চেয়েও বেশী সুন্দরী?" "নিশ্চয়ই।" আমার উত্তর শুনে বল্ল—"শুন্‌তে সত্যি খুব ভাল লাগে, কিন্তু তুমি বড্ড মদ

খাচ্ছ, মদটা দাও তো! সিরিলকে দেখে কষ্ট পাচ্ছ না তো! আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ওর আদৌ এখানে মন টিক্‌ছে না।" আমি নিশ্চিন্ত আনন্দে স্বীকার করলাম,—"ও যে আমাকেই ভালবাসে!" আন্ ভয় পেল—"তুমি যে মাতাল হয়ে গেলে। হা ভগবান! চল, বাড়ি চল।"

ওদের ছেড়ে এসে যেন ঘাড় থেকে ভূত নাব্‌ল। ভদ্রভাবে বিদায় নেওয়াও কষ্টকর হ'ল। বাবা গাড়ী চালালেন, আমার মাথাটা আনের কাঁধের ওপর ঢলে পড়ল। আমি ভাবছিলাম, আমাদের গণ্ডীর লোকেদের চেয়ে ওকে কত বেশী ভাল লাগে। ওদের সকলের চেয়ে কত উঁচুদরের মেয়ে। বাবা বেশী কিছু বল্লেন না, বোধহয় ওর কথাই ভাব্‌ছিলেন। শেষে আন্‌কে জিজ্ঞেস্ করলেন—"মেয়েটা ঘুমোল?" আন্ জবাব দিল—"শিশুর মত শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। মোটামুটি ভালই ব্যবহার করেছে—কি বল? অবশ্য ঐ মাছ ধরার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেই পার্‌ত।" বাবা হাসলেন,—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বল্লেন—"আন্, আমি তোমায় ভালবাসি, শুধু তোমাকেই ভালবাসি, বুঝেছ?" আনের জবাব কানে এল—"কেন বার বার ঐ কথা বল? আমার বড় ভয় করে যে!"

বাবার গলা—"তোমার হাতটা দাও তো!"

আমি উঠে বসে বাধা দিতে গেলাম—"দয়া করে গাড়ীর মধ্যে এসব করো না।" কিন্তু তখন আমার পুরো মত্ত অবস্থা,

আধ ঘুমের মধ্যে কথা বল্লাম। তাছাড়া আনের গায়ে সেন্টের গন্ধ, চুলের মধ্যে সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়া, সিরিলের প্রেমের চিহ্নস্বরূপ বাঁ কাঁধের কাছে ক্ষতচিহ্ন সবটুকু, মিলিয়ে আমার সুখের সীমা ছিল না, আমি তাই চুপ করে রইলাম। জন্মদিনে ওর মায়ের দেওয়া মোটর সাইকেলটায় এল্‌সা আর সিরিল উঠে চলে যাবে এই কথা ভেবে ওদের জন্যে এত দুঃখ হ'ল, যে প্রায় চোখে জল এল। আনের গাড়ীটা যেন ঘুমোবার জন্য তৈরী হয়েছিল। মোটর সাইকেলের মত দারুণ শব্দ করে নয়, সুন্দর নিঃশব্দে আনের গাড়ী চলে। ওয়েবগিন্নির রাত্রে ঘুম হবে না বুঝলাম। বোধহয় তার বয়সে আমাকেও টাকা দিয়ে নাগর ভাড়া করতে হবে, কারণ প্রেমই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারজন্যে টাকা খরচ করা সার্থক। এল্‌সা আর আনের ওপর তার যে আক্রোশ, সেটুকু জয় করতে পারলেই আর কোন গোল থাকে না। আমি নিজের মনে হাস্‌তে লাগ্‌লাম। আন্‌ কাঁধটা সরিয়ে আরাম করে শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বল্ল. "ঘুমোও", আমি ঘুমোলাম।

৮

পরদিন সকালে দিব্যি সুস্থ শরীরে ঘুম থেকে উঠ্‌লাম, শুধু ঘাড়ের কাছে একটু কন্‌কনে ভাব ছিল। প্রতিদিন সকালে আমার বিছানা রোদে ভেসে যায়, আজও তাই। আমি গায়ের কাপড় ফেলে দিয়ে, পিঠ্‌টা রোদের দিকে মেলে ধরলাম। ভারী আরাম পেলাম, সূর্যের তাপটা যেন শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেল। একটু না নড়ে সারা সকালটা ঐভাবে কাটাব ভাবলাম। মনে মনে গত রাতের কাণ্ড কারখানা নেড়ে চেড়ে দেখলাম। সিরিল যে এখনও আমাকেই ভালবাসে—একথা আন্‌কে বলেছিলাম, মনে পড়ল। মজা এই যে মত্ত অবস্থায় সত্যি কথা বল্লেও কেউ বিশ্বাস করে না। ওয়েব্‌গিন্নির কথা মনে এল। তার মত বুড়ি আমি ঢের দেখেছি। ওদের সমাজে, ও বয়সে যা' খুশী তাই করার সুযোগ বিশেষ পায় না বলে ওরা ঐ রকম তিরিক্ষি হয়ে যায়। বিশেষ করে শান্ত, দাম্ভিক আনের পাশে বুড়িকে আরও যেন নিরেট বোকা মনে হচ্ছিল। অবশ্য এর বেশী আর কি আশা করা যায়? বাবার বন্ধুদের মধ্যে এমন কারো কথা মনে এলনা, যার সঙ্গে আনের কোন তুলনা চলতে পারে! ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে যদি সন্ধ্যেটা নষ্ট করতেই হয়,'

তবে দারুণ মদ খেয়ে বাজে তর্কে মেতে ওঠা, কিম্বা দলের একজনকে টেনে নিয়ে, বিশেষ করে তারই সঙ্গে হৈ হৈ করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখি না। বাবার অবশ্য কোন মুস্কিল হবার কথা নয়। চার্লস্ ওয়েব আর বাবা দুজনেই স্বেচ্ছাচারী মানুষ!—"বলতো আজ রাতে কে আমার সঙ্গে ডিনারে আস্‌ছে এবং তার পরেও আমায় সঙ্গ দিতে রাজী হয়েছে? 'সরেলে'র নতুন ফিল্ম্‌-এর ছোট্ট মেয়ে 'মার্স'। আমি 'ডুপুই' এর বাড়ি যাচ্ছিলাম, তখন—" এই ধরনের কথাবার্তা, হাসি ঠাট্টা চল্‌তে বাবা আর মিষ্টার ওয়েবের মধ্যে। মিষ্টার ওয়েব হয়ত জবাব দিতেন—"তোমার ভাগ্য ভাল, বেটী প্রায় এলসার মত সুন্দরী।"

অপরিণত বয়সের মত কথাবার্তা, কিন্তু তাঁদের প্রাণপ্রাচুর্য আমায় মুগ্ধ করত। তাছাড়া হোটেলের বারান্দায় অনর্গল কথাবার্তায় জমে উঠে সন্ধ্যেটা যেন আর শেষ হতে চাইত না। কখনও বা লোম্বার্ডের সখেদ অনুযোগ কানে আস্‌ত—"রেমঁদ, জীবনে প্রথম বোধহয় ঐ মেয়েটা আমার মন ছুঁয়েছিল। মনে আছে—ও চলে যাবার আগে সেই বসন্তকালের কথা? সারা-জীবন একটা মেয়ের প্রেমে জড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।" মদের গেলাস হাতে দুই বন্ধু তাঁদের প্রাণের যাবতীয় গোপন কথা এই রকম অভদ্র, আপত্তিজনক কিন্তু প্রাণখোলাভাবে আলোচনা করতেন।

আনের বন্ধুরা বোধহয় কখনও তাদের নিজেদের প্রসঙ্গে আলোচনা করত না। এ জাতীয় দুষ্কর্মও তাদের ধারণার বাইরে ছিল। কদাচিৎ এ রকম আলোচনা উঠ্‌লে নিশ্চয়ই খুব অপ্রস্তুত হয়ে যেতো। এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গীদের প্রতি আমার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আস্‌ছে। আনের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে বোঝা যায়। আবার এদিকে এটাও বুঝতে পারলাম যে বছর তিরিশেক নাগাদ আমিও এদেরই মত হয়ে যাব। আনের মত শান্ত, দাম্ভিক হতে চেষ্টা করলে আমার দম আট্‌কে আসবে। আর পনের বছরের মধ্যে আমার চঞ্চল প্রকৃতিতে ভাটা পড়ে আস্‌বে, তখন হয়ত আমারই সমবয়সী কোন প্রৌঢ়ের দেহের ওপর দেহের ভার এলিয়ে দিয়ে বল্‌ব—"আমার প্রথম প্রেমিকের নাম ছিল সিরিল। তখন আমার আঠার বছর বয়স। একবার গরমেব সময়ে সমুদ্রের তীরে——"

আমার সেই ভবিষ্যতের সঙ্গিটীকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোকের চোখের পাশে ছোট ছোট বয়সের রেখা পড়বে।

দরজায় টোকা দিল কে? আমি তাড়াতাড়ি রাত-পাজামাটা গলিয়ে নিয়ে ডাক্‌লাম—"ভেতরে এস।" দেখি সাবধানে একটা পেয়ালা হাতে আন্ দাঁড়িয়ে। বল্ল—"ভাব্‌লাম এক পেয়ালা কফি হলে তোমার হয়ত ভাল লাগ্‌বে। সকালটা লাগ্‌ছে কেমন?"

আমি বল্লাম—"খুব ভাল। গত রাত্রে আমি একটু মাতাল হয়ে পড়েছিলাম—না?" হাস্তে হাস্তে আন্ বল্ল—"বাইরে গেলে সচরাচর তোমার যেমন হয়, তেমনি আর কি? কিন্তু তুমি হাসিয়েছিলে বাপু। নইলে সন্ধ্যেটা মাঠে মারা যেত।"

ওর সঙ্গে কথায় কথায় এমন মেতে উঠ্লাম যে, অমন চড়া রোদ, কড়া কফি সব ভুলে গেলাম। জীবনে কখনও তলিয়ে ভাব্তে শিখিনি, কিন্তু ওর কথায় নিজের মনে কত প্রশ্নই না জাগ্ত। ও' যেন নতুন করে বাঁচ্তে শেখাল। আমায় জিজ্ঞেস্ করল—"সেসিল্—ওয়েব, কিম্বা 'ডুপুই' এর মত মানুষ তোমার পছন্দ হয়?" আমি বল্লাম—"ওদের ব্যবহার অত্যন্ত জঘন্য, কিন্তু আসলে ওরা ভারী মজার মানুষ।" আন্ মেঝেতে একটা মাছির দিকে তাকিয়েছিল। ঘন, লম্বা চোখের পাতা; মানুষের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকান তার পক্ষে খুব সহজ ছিল। আন্ প্রশ্ন করল—"তোমার কি মনে হয় না এই সব লোকদের কথাবার্তা একঘেঁয়ে, বোকার মত! মেয়ে মানুষ, ব্যবসা বা ককটেল্ পার্টি ছাড়া এদের বলবার কিছু নেই।"

আমি উত্তর দিলাম—"বোধহয় দশবছর কন্ভেণ্টের কঠিন নিয়মকানুনের মধ্যে বাস করার পর, এদের জীবনের শিথিল নীতিজ্ঞান আমায় এদের দিকে টানে।" 'ভাল লাগে', এ'কথাটা বলার মত সাহস আমার ছিল না। আন্ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল—"দু'বছর ধরে এই জিনিষ বরদাস্ত করা কি করে সম্ভব?

যুক্তি বা নীতির প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হ'ল মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (যদি এই নামে কিছু থাকে)—অর্থাৎ রুচীর।" মনে হ'ল সে বালাই আমার নেই, পরিষ্কার টের পেলাম এদিক দিয়ে আমার অভাব আছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—"আন্, তোমার কি মনে হয় আমার মাথায় বুদ্ধি আছে?" আমার সোজাসুজি প্রশ্ন শুনে অবাক্ হয়ে হাসতে শুরু করল—"নিশ্চয়ই আছে। একথা কেন জিজ্ঞেস করছো?" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—"জানি আমি যদি বোকা হতাম, তাহলেও তুমি একথাই বলতে। কত সময়ে তোমার বিবেচনা, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আমায় কেমন যেন কাবু করে ফেলে।" আন্ বলল—"এ হলো বয়সের কথা। তোমার চেয়ে আত্মবিশ্বাস যদি আমার বেশী না থাক্‌ত, তাহলে তুমিই আমার উপর সর্দারি করতে, সেটা আরো খারাপ হতো।" আনের হাসি দেখে আমার কেমন যেন বিরক্তি এল—"সেটা খুব খারাপ নাও তো হতে পারত।" শান্ত গলায় আন্ জবাব দিল—"শুধু খারাপ নয়, সর্বনাশ হতো।" হঠাৎ হাসিঠাট্টা থামিয়ে ও আমার মুখের দিকে চাইল। আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল, আমি হাত কচলাতে শুরু করলাম; এখনও যদি কেউ আমার দিকে সোজা তাকিয়ে কিংবা খুব কাছে এসে কথা বলে, আমার অস্বস্তি হয়, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কথা শোনাবার জন্য এই জেদ, এই ধৃষ্টতা আমার সহ্য হয়না। এভাবে আমায় কোণঠাসা করার কি অধিকার আছে?

ভাগ্যক্রমে আন্ সে রাস্তায় গেল না, কিন্তু এমন করে মুখের দিকে চেয়ে রইল যে, হাল্কা সুরে কথা বলা আমার বন্ধ করতে হল। ও বল্ল—"ওয়েবের মত লোকেদের শেষ কোথায় জানো তো?" আমি মনে মনে উচ্চারণ করলাম—"আমার মত—বল!" কেমন মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল—"নদীর জলে।" আন্ বলে গেল—"একটা সময় আসে যখন মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের অবসান ঘটে, অথচ মেয়েদের পেছনে ছোটার লোভ তাদের কমে না। সেই সময়ে এদের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়, কারণ একা থাকতে পারেনা বলে রুচির মান নাবাতে এরা বাধ্য হয়। এ অবস্থায় এরা নিজেদের হাস্যাস্পদ্ প্রতিপন্ন করে। দুনিয়ার ওপর অভিমান ও রুক্ষতা এদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়।" আমি বল্লাম—"বেচারা ওয়েব।" আমার মনটা দমে গেল। তবে বাবার জীবনের পরিণতিও কি এই? কিম্বা হয়ত আন্ তাঁকে এই দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করবে। আন্ আবার বল্ল—"তুমি হয়ত কখনও জিনিষটা এভাবে তলিয়ে দেখনি—না?" দরদভরা স্মিত হাসি তার ঠোঁটের কোণে মাখান। "ভবিষ্যতের কথা বিশেষ কিছু কখনও মনে হয় না? যৌবনের এই এক মস্ত সুবিধে।" আমি বল্লাম—"যৌবন নিয়ে আমায় ওরকম আঘাত দিওনা। কৈফিয়ৎ কিম্বা সুযোগ হিসেবে আমি আমার যৌবনের অপব্যয় করিনা। আসলে একে আমি এত বাড়িয়ে দেখি না।"

আন্ অবাক্ হল—"তবে কোন জিনিষটার দাম দাও

তুমি বলতো ? তোমার শান্তি, তোমার স্বাধীনতা, কোনটা ?” এ জাতীয় আলোচনাকে বড় ভয় পাই আমি, বিশেষ করে আনের সঙ্গে। তাই বল্লাম—“জগতে কিছুই আমার কাছে অমূল্য বলে মনে হয় না। তুমি জান বসে বসে ভাবা আমার স্বভাব নয়।” আন্ বল্ল—“মাঝে মাঝে তুমি আর তোমার বাবা আমায় বড্ড বিরক্ত কর। তুমি কিছু চিন্তা কর না, কোন কাজ জাননা, কোন খবর রাখনা; এমন করে বেঁচে থাক্‌তে ভাল লাগে ?” আমি জবাব দিলাম—“নিজেকে নিয়ে আমি মোটেই খুশী নই। আমি নিজেকে ভালও বাসিনা, বাসতে চেষ্টাও করিনা। সময়ে সময়ে তুমি আমার জীবনে জটিলতার অবতারণা কর, তখন তোমার ওপর রাগ হয়।”

আন্ চিন্তিত মুখে নিজের মনে গুন্ গুন্ শুরু করল, সুরটা চেনা কিন্তু গানটা জানিনা। ওকে জিজ্ঞেস করলাম—“আন্ গানটা কি বলতো! এটা শুন্‌লে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।” এবার যেন একটু নিরাশ হয়ে মৃদু হেসে বল্ল—“জানিনা। চুপ করে শুয়ে বিশ্রাম কর। এ পরিবারের মস্তিকের গোলযোগটা কোথায়, তার সন্ধানে আমি এখন অন্য কোথাও ঘা দিতে চল্লাম।”

আমি ভাবলাম, বাবার পক্ষে এ বিড়ম্বনা এড়ানো অনেক সহজ হবে। কল্পনা করতে বেগ পেতে হ’ল না, বাবা কি বল্‌বেন—“আন্, তোমায় ভালবাসি, এছাড়া আর কোন কিছু বর্তমানে আমার মাথায় ঢুক্‌ছেনা।” এত বুদ্ধিমতী হয়েও আন্

বাবার কথা সত্যি বলে মেনে নেবে। বালিশে মাথা গুঁজে দিয়ে দিব্যি পরিপাটি হয়ে শু'লাম। আন্ যেন একটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে চলেছে। পঁচিশ বছরের মধ্যে বাবার ষাট বছর বয়স হবে; সাদা মাথা নিয়ে বসে বসে হুইস্কি টান্‌বেন, আর অতীতের স্মৃতিতে রং চড়াবেন। আমরা একসঙ্গে বেড়াতে বেরোব, আমি আমার দুঃসাহসের বড়াই করে গল্প বলব, আর বাবা আমায় উপদেশ দেবেন। হঠাৎই খেয়াল হ'ল আনকে আমাদের ভবিষ্যতের এই ছবি থেকে বাদ দিচ্ছি; আসলে ও কি করে এর মধ্যে মানিয়ে নেবে, এখনও আমার মাথায় আসছে না।

আমাদের প্যারিসের সেই লণ্ডভণ্ড বাড়ি কখনও খাঁ খাঁ করে, কখনও আবার ফুলে ছেয়ে যায়; বেশীর ভাগই জিনিষ পত্রে বোঝাই থাকে। এর মধ্যে আন্ কি করে শান্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব এনে ফেল্‌বে, সে আমার কল্পনাতীত। আনের তো এই স্বভাব— যেখানে যায়, সেখানে অমূল্য সম্পদের মত তার সঙ্গে এই সব বয়ে নিয়ে যায়। আমার আশঙ্কা হ'ল বৈচিত্র্যহীন জীবনধারা আমাদের বুকের ওপর ভার হয়ে চেপে বস্‌বে। কিন্তু সিরিলকে ভালবেসে আমার অনেক দুর্ভাবনা কেটে গেছে, তেমনি এটাও যাবে বলে আশা করা যায়। তবু, একঘেয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে আমি জীবনে সবচেয়ে ভয় করে চলি। শূন্য হৃদয় শান্ত করার চেষ্টায় আমাকে আর বাবাকে কৃত্রিম উত্তেজনার সন্ধান করে মরতে হয়। আর এই কথাটাই আন্ কিছুতে মান্‌তে চায় না।

৯

আন্ আর আমার বিষয়ে অনেক বলেছি, এবার বাবার কথা কিছু বল্ব। এ বইয়ে তাঁর ভূমিকাই হ'ল প্রধান। আমার মনের গভীরে যে ভালবাসা চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে আছে, তার সবটুকুই তাঁর প্রাপ্য। আমি তাঁকে খুব ভাল করে চিনি, সেই জন্যেই তাঁর সম্বন্ধে আমি সহজে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। সর্বাগ্রে আমি তাঁকেই সমর্থন করতে চাই, বড় করে তুলে ধরতে চাই। তাঁর না ছিল অহঙ্কার, না ছিল স্বার্থপরতা; একমাত্র দোষ ছিল তাঁর অপরিমিত চাপল্য। দায়িত্ববোধ বা দরদের অভাব তাঁর ছিল না। আমার প্রতি তার স্নেহের কোন আদি অন্ত ছিল না, কিন্তু শুধুমাত্র পিতৃস্নেহ বল্লেও একে ছোট করা হবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আঘাত কেউ যদি তাঁকে দিতে পারে, সে আমি। আমার অবস্থাও তথৈবচ। যেদিন তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বস্লেন, সেদিন আমার মনে হয়েছিল তিনি যেন আমাদের ত্যাগ করে গেলেন। তাঁর নিজস্ব প্রেমের ব্যাপারগুলোর চেয়ে; আমি তাঁর অনেক বেশী আপন। পার্টি থেকে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে বাবা যে কত অমূল্য সুযোগ হারিয়েছেন, তার ঠিকানা নেই। আবার

একথাও অস্বীকার করবনা যে তাঁর ব্যবহারে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল এবং তিনি সহজিয়া মনোবৃত্তির মানুষ ছিলেন। প্রত্যেক ঘটনাকে তিনি দৈহিক ভিত্তিতে বিচার করতেন এবং বেশ জোর গলায় একে সুস্থ মনের প্রমাণ বলে প্রচার করতেন। হয়ত বল্লেন—"তোমার একটুও ভাল লাগ্‌ছে না—না? বেশী ঘুমোও মদটা কম খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।" যখন বিশেষ কোন মেয়েকে পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন, তখন এই সহজিয়া রাস্তা ধরতেন। প্রবৃত্তিকে দমন করার চেষ্টাও যেমন তাঁর দিক থেকে ছিল না, তেমনি স্বাভাবিক দৈহিক চাহিদার ওপর রং এর পোঁচ দিয়ে খুব একটা হৃদয় ঘটিত ব্যাপার করে তুলতেন না। চরম বাস্তবপন্থী মানুষ হলেও বাবার মনটা ছিল শিশুর মত কোমল, দরদী। এল্‌সার ওপর এই সাময়িক ঝোঁকটা এসে পড়ায় আমাদের সহজ জীবনযাত্রার পথে বাধা ঘট্‌ছিল, কিন্তু তার স্বরূপটা সকলে বুঝবেনা। ওঁর মনের কথা এ নয়—আনকে প্রতারণা করাই আমার উদ্দেশ্য, সেই জন্যেই ওর ওপর ভালবাসার মাত্রাটা কমিয়ে আন্‌তে চাই। বরং উল্টোটাই এল্‌সাকে দেখে এমন মাথা খারাপ হ'ল কেন আবার? এযে বিষম জ্বালা! যত শিগ্গির সম্ভব ওকে একবার না পেলে আনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে জটিলতার সূত্রপাত হতে পারে। উপরন্তু আনের প্রতি ভালবাসার মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল জড়িয়ে।

বাবার চারপাশে যত রাজ্যের বোকা, হাল্কা মেয়েদের থেকে আনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবাকে এত ভাল করে চিনেছিল বলেই আন্ একাধারে তাঁর পৌরুষ, তাঁর গর্ব, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন করে নাড়া দিতে পেরেছিল। নিজস্ব বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে বাবাকে সাহায্য করার ক্ষমতা একমাত্র তারই ছিল। নিজের আদর্শ সহচরী, আমার আদর্শ মা হিসেবে বাবা তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন ; কিন্তু আমার মনে হয় বাবার উপযুক্ত স্ত্রী হতে হলে যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হয়, সেদিক থেকে আন্‌কে তিনি সম্পূর্ণ যোগ্য মনে করতেন না। আমার ধারণা হয় যে সিরিলের মত আন্‌ও বাবাকে আর আমাকে সাধারণ মানুষের ব্যতিক্রম বলে ধরে নিয়েছিল। তবু নিজের জীবন-ধারার ওপর কোন রকম আস্থা ছিল না বলেই আনের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারটাকে এত শোভন ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

আমি যখন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন থেকে আন্‌কে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলাম, তখন বাবার জন্যে বিশেষ দুশ্চিন্তা হয়নি, কারণ আমি জানতাম একজনের অভাব আর একজনকে দিয়ে তিনি অনায়াসে পুষিয়ে নিতে পারবেন। আনের স্বামী হিসেবে বাকী জীবন কাটানোর চেয়ে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করা তাঁর পক্ষে অনেক সহজ হবে। ঠিক্ আমার মত, বাবার পক্ষেও বাঁধাধরা নিয়মের দাস হয়ে থাকা সবচেয়ে মারাত্মক হবে। আমরা দুজনেই একগোত্রের মানুষ। মাঝে মাঝে,

মনে হ'ত যে, আমরা দুজন অকৃত্রিম যাযাবর জাতীয় সুস্থ, সুন্দর দুটি অপভ্রংশ বিশেষ, আর সকলে জৈবশক্তির ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

এই সময়ে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন; কারণ তাঁর সেই সময়ের সুখের জীবন, যৌবনের সামনে এল্‌সা মূর্তিমতী প্রণয়িণীর বেশে ঘোরাফেরা করে তাঁকে উত্যক্ত করে তুলেছিল।

আমি বাবার মনের কথাটা টের পেলাম। তিনি যেন এই কথা বলবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন—"আন্‌, লক্ষ্মীটি! একদিন আমায় ছুটি দাও। এলসার কাছে প্রমাণ করে আসি যে, যৌবন আমার শেষ হয়নি এখনও।"

এ এক অসম্ভব ব্যাপার! এমন নয় যে আনের মনে কোন হিংসা আছে। এসব জঘন্য ব্যাপার আলোচনা করার মত হীনতা স্বীকার করাও তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ সে যে আমাদের তার নিজের মত করে গড়ে নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছে। সবরকম অসংযম, ব্যভিচার, বুড়োবয়সে ছেলেমানুষী করার প্রবৃত্তিকে সে সমূলে উৎপাটিত করবে। ভবিষ্যতে বাবা শুধু নিজের খেয়ালের পেছনে ছুটে বেড়াবেন না—এই আশায় সে নিজেকে বাবার হাতে সঁপে দিচ্ছে। আন্‌কে দোষ দিই কেমন করে? তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। এ সত্ত্বেও এলসার প্রতি বাবার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে গেল। আর যতদিন যায়, তত তাকে পাওয়ার আশাও যেন দূরে সরে যায়।

আমি এক মুহূর্তে সব বন্দোবস্ত করে দিতে পারতাম।

অনায়াসে এলসাকে এনে অল্প সময়ের মধ্যে বাবার সখ মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম। একদিন বিকেলে দিব্যি আন্‌কে ভুলিয়ে 'নিস্‌' এ নিয়ে চলে যেতাম। ফিরে এসে দেখতাম্‌ বাবার এই অস্থিরতা কেটে গিয়েছে, এবং এর মধ্যেই বৈধ প্রেমের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে নতুন কোন তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন (অর্থাৎ যে প্রেম শিগ্‌গিরই বৈধ রূপ ধারণ করবে)। আন্‌ কিন্তু কিছুতেই অন্য মেয়েদের মত উপপত্নীর ভূমিকায় থাক্‌তে রাজী হতোনা। তার আত্মমর্যাদা আর দাম্ভিকতার দরুণ আমাদের জীবনে কি দারুণ জট পাকিয়ে তুলেছে!

আমি কিন্তু এলসাকে কিছুই বল্লাম না, আর আন্‌কে 'নিস্‌' এ সরিয়ে নিয়ে গেলাম না। বাবার ভেতর আকাঙ্ক্ষার দাবানল জ্বলতে থাকুক্‌ এই তো আমি চাই, যাতে শেষপর্যন্ত তিনি নিজের কাজ হাসিল করতে বাধ্য হবেন। আমাদের বিগত জীবন নিয়ে, যা আমাদের আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে তাই নিয়ে আনের এই বিতৃষ্ণা আমার অসহ্য লাগ্‌ত। ও'কে নীচু করা আনের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের রাস্তা ওকে মেনে নিতেই হবে এই আমার পণ। এরজন্যে একদিন বাবার বিশ্বাসঘাতকতা ওর চোখে পড়া দরকার। তার আত্মশ্লাঘায় আঘাত দেবার জন্যে নয়, শুধু জৈব জীবনের সখ মেটানোর জন্যে মানুষ এ রাস্তায় আস্‌তে বাধ্য হয়, এটুকু তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো দরকার। যদি নিজেকে সে 'নির্ভুল' প্রমাণ করার জন্যে ব্যস্ত

হয়ে থাকে, তবে আমাদের 'ভুল' করার পথে বাধা সৃষ্টি করার তার কোন অধিকার নেই।

বাবার অবস্থা যেন আমার মোটেই চোখে পড়ছে না আমি এটাই দেখাতে চাইলাম। এলসাকে খবর দিয়ে, আন্‌কে সরিয়ে নিয়ে আমি মোটেই মধ্যস্থতা করব না। আনের পবিত্র ভালবাসার রূপটাই আমার চোখে পড়েছে, এই আমি শুধু দেখাতে চাইলাম। এ আর শক্ত কি? তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন, এবং আন্‌কে পর্যন্ত এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা করেন, এ চিন্তায় এক অজানা আতঙ্কে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত।

ইতিমধ্যে আমাদের দিনগুলো সুখেই কেটে যাচ্ছিল। এলসার প্রতি বাবার আগ্রহ বাড়াবার কোন সুযোগ আমি বেহাত হতে দিলাম না। আনের মুখ দেখে আর আমার কষ্ট হয় না। মাঝে মাঝে মনে হ'ত ও' বুঝি আমাদের সবকিছু মেনে নিতে পারে, তাহ'লে আমাদের তিনজনের জীবনযাত্রার পথে আর বাধা রইল কোথায়? আমি প্রায়ই সিরিলের সঙ্গে দেখা করতে লাগ্‌লাম। গোপনে আমাদের প্রেম জমে উঠ্‌ল। পাইনের গন্ধ, সমুদ্রের শব্দ, প্রেমিকের স্পর্শ আমায় আচ্ছন্ন করে রাখ্‌ল।

সিরিল কষ্ট পেতো। তার ওপর যে ভূমিকা আমি চাপিয়ে-ছিলাম, তাতে তার আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। শুধু আমি বুঝিয়ে ছিলাম যে আমাদের প্রেমের সুবিধের জন্যে তাকে আর কিছু-দিন এভাবে চালিয়ে যেতেই হবে। এর মধ্যে প্রতারণার অন্ত

ছিলনা, বহু ব্যাপার গোপন করে যেতে হ'ত। কিন্তু ছু'একটা মিথ্যে কথা বলতে আমার বিশেষ কিছু আট্‌কাতো না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে আমি, একমাত্র আমি সমস্ত ব্যাপারটাকে সাম্‌লে চলেছি।

এ অবস্থা শিগ্গির কাটিয়ে ওঠা দরকার, কারণ যদি কখনও ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, তখনই অতীতের বহু স্মৃতি বেদনার বাধা সৃষ্টি করবে। এখনও আনের মধুর হাসি, আমার প্রতি তার সমবেদনার কথা মনে হলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। এই ছুর্বিসহ সময়গুলো পার হয়ে আসার জন্যে হয় সিগ্রেট্‌ ধরাই, নয় রেকর্ড বাজাই, নয় বন্ধুকে ফোন করি। তারপর আস্তে আস্তে মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিই। স্মৃতির বেদনার সাথে যুদ্ধ না করে বিস্মৃতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকার মত দীন মনোবৃত্তি আমার নয়।

১০

মাঝে মাঝে মানুষের অদৃষ্ট বিচিত্ররূপে দেখা দেয়। সেবার গরমের ছুটিতে দেখা দিল অতি সাধারণ এক সুন্দরী মেয়ে এল্‌সার রূপ ধরে। বোকার মত হঠাৎ প্যাড়া কাঁপিয়ে হেসে ওঠা ছিল তার অভ্যাস।

বাবার ওপর এই হাসির প্রতিক্রিয়া আমার চোখ এড়ায়নি। তাই আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম যে, সিরিলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে যখনই আমাদের সঙ্গে 'হঠাৎ' সাক্ষাৎ হয়ে যাবে তখনই যেন সেই হাসির সদ্ব্যবহার করে। আমার নির্দেশ দেওয়া ছিল—"বাবার সঙ্গে আমাকে দেখ্‌লেই, কোন কথা না বলে শুধু চিৎকার করে হাস্‌তে থেকো।" আর সেই হাসি কানে যাওয়া মাত্র বাবার চোখে মুখে রাগ ফুটে ওঠে। রঙ্গমঞ্চের পরিচালকের কাজ আমার ভালই চলছিল, আমার ভূমিকায় আমি পুরো নম্বর উঠিয়ে নিচ্ছিলাম, কারণ সিরিল আর এল্‌সাকে তাদের কাল্পনিক সম্পর্ক সাড়ম্বরে জাহির করে বেড়াতে দেখে, বাবার মত আমিও অন্তরের জ্বালা চেপে রাখতে পারতাম না, মুখের ওপর তার ছায়া ঠিকই এসে পড়ত। এল্‌সার ওপর সিরিলকে ঝুঁকে পড়তে দেখ্‌লেই বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠ্‌ত। সবই যে আমার নির্দেশে

ঘটে যাচ্ছে, তখনকার মত সেকথা ভুলে যেতাম, মনে হ'ত এই ব্যভিচার থামাবার জন্যে আমি বোধহয় দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে দিতে পারতাম।

এছাড়া আমাদের দৈনিক জীবন, আনের গড়া শান্তি, মাধুর্য, পরস্পরের ওপর বিশ্বাস আর (যদিও বলতে বিরক্ত লাগে) তার নিজস্ব পরিতৃপ্তির স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্ছিল। অহঙ্কারী বলেই বোধহয় আমার মনে হ'ত, আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই ও যেন সুখে ডগ্‌মগ্‌ করছে। আমাদের প্রচণ্ড প্রবৃত্তির তাড়না, আর হীন ষড়যন্ত্র থেকে অনেক দূরে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে যেন ওর বাস। আমার ভরসা ছিল, তার সতন্ত্রতা, দাম্ভিকতা, সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস—সব মিলিয়ে ধরে নেওয়া চলে যে, ও কখনও গায়ের জোরে বাবাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করবে না। ওর ওপর কেমন যেন মায়া হ'ল। অনেক সময়ে রণভেরীর মত করুণাও মানুষকে দুষ্কর্মে উদ্দীপনা যোগায়।

একদিন সকালে ঝি'টা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমায় একখানা এল্‌সার হাতে লেখা চিঠি দিয়ে গেল। "সব ঠিকমত চলেছে। চলে এস।" —আশু কোন দুর্যোগের সঙ্কেত যেন! বাস্তব জীবনে নাটকীয়ভাবে যবনিকা পতন দেখতে আমার অসহ্য ঠেকে। এল্‌সার সঙ্গে সমুদ্রের তীরে দেখা করলাম—ও যেন বিজয়িনীর গর্বে ফেটে পড়ছে, বল্ল—"ঘণ্টাখানেক আগে তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। অনেক কথা হ'ল।",

আমি বল্লাম—"বাবা কি বল্লেন—শুনি ?"

এল্‌সা জবাব দিল—"অপরাধ স্বীকার করে অনেক দুঃখ করে গেল। বল্ল আমার প্রতি তার ব্যবহারটা খুবই জঘন্য হয়েছে। আসলে কথাটা তো সত্যি!" বুঝলাম, ওর কথা মেনে নেওয়াই এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এলসা বলে চল্ল—"তারপর যেমন করে প্রেম করা ওর স্বভাব, সেইরকম ফিসফিসিয়ে অনেক প্রশংসা করে গেল। এর মধ্যে ও যে আমার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে—" বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"বাবার কথায় কি বুঝলে ?"

এল্‌সা বোকার মত বল্ল,—"বিশেষ কিছু নয়। ওঃ হ্যাঁ, আমি যে ওকে ক্ষমা করেছি, একথা প্রমাণ করার জন্যে ওর সঙ্গে গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে একদিন চা' খেতে নেমন্তন্ন করে গেল। যাব ?" যে মেয়ের মাথাভরা লাল চুল, তার কাছ থেকে ক্ষমা পাবার জন্যে বাবার এই ব্যাকুলতা যে কোন মনোবৃত্তির ইঙ্গিত করে, সে কথা ভেবে হাসি চাপা দায় হ'ল। আমি কাছে এসে বল্লাম যে, এবিষয়ে নতুন করে বলার মত কিছু নেই, ইচ্ছা হলে যাবে, ইচ্ছা না হলে যাবে না। পরক্ষণে বুঝলাম যে তার এই জয়ের ব্যাপারে ও আমাকেই ধন্যবাদ দিতে চায়। যাইহোক্ বড় বিরক্তি এল, মনে হ'ল নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিয়েছি। আবার একটু চটে গিয়ে বল্লাম—"তুমি যাবে, কি যাবে না সে কথা আমি জান্‌ব কি করে ? সব সময়ে তুমি কি করবে, সে কথা কি

আমায় বলে দিতে হবে ? লোকে ভাব্বে আমি বুঝি তোমায় কু-পরামর্শ দিয়ে—"।

ও' বল্ল—"কথাটা কি তাই নয় ? তোমার জন্যেই তো…" ওর গলায় যে প্রশংসার স্বর বেজে উঠ্ল,—তাতে আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্ল। আমি বলে ফেল্লাম—"ইচ্ছে হয় তো যেও। কিন্তু দয়া করে এর পর থেকে এ বিষয়ে আমায় আর কিছু শোনাতে এস না।" এল্সা তো অবাক্—"কিন্তু সেসিল্ সেই মেয়ে মানুষটার হাত থেকে রেঁমদ্‌কে বাঁচাবার জন্যেই তো আমাদের এত কষ্ট করা—নয় ?"

ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এলাম। বাবার যা খুশী করুন, আন্ যেমন করে খুশী নিজেকে বাঁচাক্—আমি আর ভাব্তে পারি না। সিরিলকে শুধু আমার দারুণ প্রয়োজন। যে উৎকণ্ঠা আমায় ভূতে পাওয়ার মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় প্রেমের কোলে মুখ লুকোন। এছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না।

সিরিল আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে কোন কথা না বলে কোথায় যেন নিয়ে গেল। ব্যগ্রব্যাকুল প্রেমের জোয়ারে সব জ্বালা জুড়িয়ে এল। পরে ওর রোদেপোড়া দেহটার পাশে শুয়ে শুয়ে আমার সমস্ত অনুভূতি হারালাম ; আত্মাটা যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাঙ্গা জাহাজের মত শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ; আস্তে আস্তে ওর কাছে স্বীকার করলাম যে নিজের জীবনে আমার

বিতৃষ্ণা এসেছে। সত্যি কথাটা স্বীকার করলেও, পেছনে কোন বেদনাবোধ ছিল না, ছিল শুধু আনন্দে গা ভাসিয়ে দেবার স্বপ্ন! আমার কথা বিশ্বাস করল না, বল্ল—"কোন ভাবনা নেই তোমার। আমার ভালবাসার জোরে তোমায় আমি নিজের সম্বন্ধে আমার মত করে ভাব্‌তে শেখাব।" দুপুরে খাবার সময়ে বারবার ঐ কথাটাই মনে হচ্ছিল—"আমি তোমায় এত ভালবাসি।"

এইজন্যে সেদিন দুপুরে খাবার টেবিলের ঘটনা যতই মনে করতে চেষ্টা করি না কেন, আর কোন কথাই মনে আসে না। অ্যানের সেদিনের পোষাকটা ছিল বেগুনি রংএর। ওর নিজের চোখে, বা চোখের নীচে যে হাল্কা বেগুনির আভা পড়ে, সেই রং। বাবা খুব হাসছিলেন,—আসলে নিজেকে নিয়ে বেশ খুশী হয়েছেন বোঝা গেল। তাঁর মতে সবই ঠিক্‌ঠিক্ চল্‌ছিল কিনা! খাবার সময়ে বল্লেন, বিকেলে গাঁয়ের দিকে তাঁর কিছু কেনাকাটা আছে। আমি আপনমনে হেসে মরি। সমস্ত ঘটনাটার ওপর ক্লান্তি এসেছিল আমার, তাই অদৃষ্টের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম।

সাঁতার কাটার অদম্য ইচ্ছে মনের মধ্যে; চারটের সময়ে জলে নেমে গেলাম। বাবা গাঁয়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম। আমি ওঁর সঙ্গে কোন কথাই কইলাম না, এমন কি সাবধান হবার কথাও মনে করিয়ে দিলাম না।

জলটা সেদিন ভারী মিষ্টি রকম গরম ছিল। আন্ এলনা। বোধহয় ছুটির পরে নতুন যে ডিজাইনগুলো বাজারে ছাড়বে তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে বাবা এল্সার সঙ্গে এই সময়টুকুর সবরকম সদ্ব্যবহার করে নেবেন। ঘণ্টা দুই ধরে, সারা গায়ে রোদ মেখে নিয়ে, আমি ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে একটা খবর কাগজ টেনে নিয়ে বারান্দার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম।

সেই মুহূর্তে আন্ বনের পথ দিয়ে বেরিয়ে এল। হাত দুটো শরীরের দুপাশে জোড়া করে বিশ্রী বেকায়দায় দৌড়ে আস্ছিল। হঠাৎ ভূত দেখার মত ভয় পেলাম। মনে হ'ল এক বুড়ি বুঝি দৌড়ে এসে এক্ষুনি আমার গায়ের ওপর হুম্ড়ি খেয়ে পড়বে। আমি এতটুকু নড়লাম না, ও গ্যারেজের দিকে চলে গেল। চট্ করে বুঝে নিলাম, কি ঘট্তে চলেছে, ওর পেছনে পেছনে ছুটে গেলাম। ততক্ষণে ও গাড়ীতে বসে পড়েছে, আমি দরজাটা ধরে ফেল্লাম। আমি আর্তনাদ করে উঠ্লাম—"আন্ যেও না, তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

আমার কথা ওর কানে গেল না, নীচু হয়ে ব্রেকটা খুলে দিল। আমার আর্তনাদ,—"আন্ তোমাকে আমরা চাই, তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে।"—শুনে সে সোজা হয়ে বস্ল—ওর মুখখানা কান্নায় বেঁকে গেছে, এতো শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি নয়, এযে আমাদেরই মত সুখদুঃখে গড়া

রক্ত মাংসের মানুষ। খুব সম্ভব ছোট বেলা থেকে চাপা স্বভাব ওর, ধীরে ধীরে বড় হবার সঙ্গে এমনি এক পরিপূর্ণ নারীত্বে বিকশিত হয়েছে। এই চল্লিশ বছর বয়সে, ওযে সম্পূর্ণ একা। একটি মানুষকে ভালবেসে দশ বিশটা বছর সুখে কাটাবার সাধ হয়েছিল। আমি,—আজ ওর ঐ বিকৃত, বেদনার্ত মুখখানার জন্যে একা আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। স্তম্ভিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ওর গাড়ীর দরজার ওপর নুয়ে পড়লাম। আন্ বল্ল—"আর কাউকে তোমাদের প্রয়োজন নেই, না তোমার, না বাবার।" গাড়ীর এঞ্জিন চল্‌তে শুরু করেছে। আমি মরিয়া হয়ে গেছি, কিছুতে ওকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া চল্‌বে না।—"ক্ষমা কর, তোমার পায়ে পড়ি।" "ক্ষমা করব? তোমাকে? কেন?" গালের ওপর দিয়ে চোখের জলের ধারা বয়ে চলেছে, সেদিকে ওর খেয়াল নেই!—"বাছা আমার।" বলে এক মিনিট আমার গালের ওপর হাত বুলিয়ে আদর করল, তারপর গাড়ী ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ীটাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। আমার দেহমন অসাড় হয়ে এল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। ওর মুখখানা আবার চোখের ওপর ভেসে উঠ্‌ল।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম, বাবা এসেছেন। এল্‌সার লিপ্‌স্টিকের চিহ্ন মুখ থেকে মুছে, জামা কাপড়ের ওপর থেকে পাইন গাছের কাঁটাগুলো খুঁটে ফেলে, ধীরে সুস্থে এসে

দাঁড়িয়েছেন। আমি বাবার গায়ের ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম—"তুমি কি মানুষ?" আমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লাম। বাবা অবাক হয়ে বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—"কি হ'ল? আন্‌ কোথায়, সেসিল্‌—বল আমায়, সেসিল্‌......"

১১

এরপর একেবারে খাবার টেবিলে বাবার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। হঠাৎ এতদিন পরে শুধু দুজনে মুখোমুখি বসে খেতে বসে দুজনেই বিব্রত বোধ করছিলাম—আমাদের কারুরই খিদে ছিল না। আন্‌কে ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে—একথা দুজনেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। যাবার আগে বিষাদের কালিমা মাখা সেই মুখ আমি ভুলতে পারছিলাম না। তারজন্যে আমি নিজেই যে সম্পূর্ণ দায়ী একথা ভেবে আমার অশান্তির সীমা ছিলনা। এই সকল ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমারই প্রখর বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে—সে কথা আর মনে রইল না। পায়ের নীচ থেকে যেন ভিৎ খসে যাচ্ছে। বাবার অবস্থা অবিকল আমারই মতই শোচনীয়। বাবা বল্লেন—"তোমার কি মনে হয় আমাদের ছেড়ে ও বেশীক্ষণ থাকতে পারবে?" আমি জবাব দিলাম—"আমার মনে হয় ও' প্যারিসে ফিরে গেছে।" বাবা যেন স্বপ্ন দেখছেন—"প্যারিসে।" ভাঙ্গা গলায় বল্লাম—"জীবনে আর বোধহয় কখনও ওর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে না।" কোন কথা খুঁজে না পেয়ে টেবিলের ওধার থেকে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরলেন। অনেকক্ষণ পরে বল্লেন—"নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রাগ হয়েছে তোমার। আমার যে কি মতিভ্রম হয়েছিল জানিনা। বনের পথে এল্‌সার

সংগে আসছিলাম,—হ্যাঁ—আর—ওকে চুমুও খেয়েছিলাম। বোধহয় ঠিক ঐ সময়টাতে আন্ ওদিকে এসে পড়েছিল।”

বাবার কথা আমার কানে গেল না। পাইন বনে এলসা আর বাবার আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা কল্পনা করতে পারলাম না। সেদিনের একটিমাত্র ছবি আমার চোখে ভাস্ছে, সেটা হ'ল আনের প্রতারিত হবার অসীম বেদনার ছায়া। বাবার কাছ থেকে একটা সিগ্রেট নিয়ে ধরালাম। খাবার সময়ে সিগ্রেট্ খাওয়া আন্ পছন্দ করত না।

বাবার দিকে ফিরে ম্লান হেসে বল্লাম—“আমি বেশ বুঝতে পারি। এ তোমার দোষ নয়। একেই বলে ‘ক্ষণিকের ভ্রান্তি।’ কিন্তু আন্‌কে আমাদের ফিরে পেতেই হবে। আমাদের বিশেষ করে তোমাকে ওর ক্ষমা পেতেই হবে।” বাবা নিরুপায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—“কি করা যায় বলতো?”

বাবার চেহারা এত খারাপ দেখাচ্ছিল যে তাঁর ওপর মায়া হ'ল। আন্ এমন করল কেন? মুহূর্তের একটা ত্রুটীর জন্যে আমাদের এমন করে ভাসিয়ে দিয়ে গেল?

আমাদের প্রতি তারও তো একটা কর্তব্য আছে! শেষ পর্যন্ত আমি বল্লাম—“একটা চিঠি লিখলে হয় না? গত তিন ঘণ্টা ধরে বাবা একভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে ছিলেন, ভাবটা বোধহয় এতক্ষণে কাটল। খাওয়া শেষ না করেই আমরা টেবিলের চাদরটা উঠিয়ে ফেল্লাম। বাবা একটা বাতি

কলম আর কিছু চিঠির কাগজ আন্তে চলে গেলেন। আমরা মুখোমুখি বসলাম—এতক্ষণে মনে হ'ল আন্‌কে ফিরিয়ে আনার একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। মনটা একটু যেন হাল্কা হ'ল। জানালার বাইরে একটা চাম্‌চিকে ছট্‌ফটিয়ে মরছিল। বাবা লিখতে শুরু করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় বাতির কাছে বসে ছেলেমানুষের মত আবোল তাবোল মনগলানো কথা দিয়ে ভরে চিঠি লিখে আন্‌কে ফিরিয়ে আনার যে ব্যর্থ প্রয়াস আমরা দুজন করেছিলাম, সে কথা ভাবলে আজও ভয়ে, তিক্ততায় মনটা কেঁপে উঠে। শেষপর্যন্ত বহু কষ্টে প্রচুর কৈফিয়ৎ, ভালবাসা আর অনুতাপের বাষ্পে ভরা দুখানা চিঠি তৈরী হ'ল। আমার চিঠি শেষ করে মনে হ'ল এ চিঠির আবেদন অগ্রাহ্য করা আনের সাধ্যের বাইরে। আন্‌কে এবার ফিরে পাবই পাব। ও আমাদের ক্ষমা করে ফেলেছে—এ ধরনের কল্পনাও করে ফেল্লাম চট্‌ করে। আমাদের প্যারিসের বাড়ির বসবার ঘরে যেন এই ক্ষমা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা ঘটবে। আন্‌ ঘরে ঢুকবে—ঠিক এই সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাইলাম, মনে যেন আশা হ'ল আন্‌ই বোধহয় আমাদের ক্ষমা করে আবার এখানে ফিরে আসবে, একথা বলতে ফোন্‌ করছে। বাবা লাফিয়ে উঠে খুশী-ভরা গলায় ডাক দিলেন—"হ্যালো"! তারপর শুধু "হ্যাঁ! হ্যাঁ!" কোথায়? কোন্‌ জায়গায়? হ্যাঁ! "বাবার গলা যেন বুঁজে

এল। আতঙ্কে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাবা নিজের মুখের ওপর নিজেরই অজান্তে হাতখানা একবার বুলিয়ে নিলেন। শেষপর্যন্ত আস্তে করে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে আমার কাছে ফিরে এলেন—"এষ্ট্রেলের পথে আনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঠিকানা খুঁজে পেতে সময় লাগে, শেষ অবধি প্যারিসে আমাদের ঠিকানায় ফোন করে নম্বর পেয়েছে।"

একঘেয়ে আবেশহীন গলায় বাবা বলে গেলেন—বাধা দেবার সাহস হ'ল না। "সবচেয়ে মারাত্মক বাঁকের মুখে ঘটনাটা ঘটে। মনে হচ্ছে ঐ জায়গায় এ নিয়ে অনেকগুলো হ'ল। গাড়ীটা খাড়াই থেকে পঞ্চাশ ফুট ছিটকে গিয়ে পড়েছিল। ও যদি বেঁচে থাক্‌ত তবে সেটা নেহাৎ দৈব বলেই মেনে নিতাম।"

বাকী রাতটা নিশি পাওয়ার মত কেটে গেল। হেড্ লাইটের সামনে খাড়া রাস্তা, পাথরের মত কঠিন বাবার মুখের রেখাগুলো, শেষপর্যন্ত হাসপাতালের দরজা পার হওয়া, এই শুধু মনে পড়ে। বাবা আমায় আন্‌কে দেখতে দিলেন না। ভেনিসের একটা ছবির দিকে চেয়ে ওয়েটিংরুমের একটা বেঞ্চের ওপর ঠায় বসে রইলাম। মনটা অসাড় হয়ে গেছে। একটি নার্স বল্ল গ্রীষ্মের ছুটির শুরু থেকে এ নিয়ে ঠিক ঐ জায়গায় ছটা দুর্ঘটনা ঘটল। অনেক, অনেকক্ষণ পরে বাবা আমার কাছে ফিরে এলেন। তখন আমার মনে হ'ল মৃত্যুর ভেতর দিয়েও

আন্ প্রমাণ করে গেল, আর সকলের চেয়ে কত পৃথক ছিল তার সত্তা। আমাদের যদি আত্মহত্যা করার সাধ বা সাহস থাকত তবে আমরা বড়জোর একটা বিস্তারিত চিঠি লিখে, যাদের জন্যে আত্মহত্যা করতে চাই, তাদের সকলকে দায়ী করে, মাঝরাতে মাথার ভেতর দিয়ে গুলি চালিয়ে দিতাম। কিন্তু আন্ দুর্ঘটনার রূপ দিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু আমাদের উপহার দিয়ে গেল যেন! রাস্তার মাঝে বিপজ্জনক বাঁক, গাড়ীটার পক্ষেও ভারসাম্য রাখা সম্ভব নয়। আমাদের মত দুর্বল প্রকৃতির লোকেদের পক্ষে এ জিনিষ মেনে নেওয়া কত সহজ। একে আত্মহত্যা বলা আমার মনের কল্পনাবিলাসও হতে পারে। আমার এবং বাবার মত মানুষ যাদের কাছে জীবিত বা মৃত কারুরই কোন মূল্য নেই—তাদের জন্যে কেউ আবার আত্মহত্যা করে নাকি? আমরা পরস্পরের কাছে একে দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু বলে উল্লেখ করতে পারলাম না।

পরদিন বেলা তিনটের সময়ে বাড়ি ফিরে দেখি সিরিল আর এলসা আমাদের সিড়ির ওপর বসে অপেক্ষা করে আছে। মনে হ'ল অভিনয়ের মধ্যে ভুলে যাওয়া দুটি বিদূষকের চরিত্র, জীবন্ত মূর্তিতে বসে আছে। এরা আন্‌কে চিন্‌ত না। তারা তাদের প্রণয়ের ডালি সাজিয়ে, সৌন্দর্য ও বিড়ম্বনার ভার নিয়ে অপেক্ষা করছে। সিরিল এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল। বাস্তবিক ওকে আমি ভালবাসিনি। ওর মিষ্টি মধুর স্বভাবের আকর্ষণ এড়াতে পারিনি—এই পর্যন্ত। যে আনন্দ ওর কাছে

পেতাম, সেটুকু আমার ভাল লাগত, আমার প্রয়োজন মেটাতে। আমরা চলে যাবো। আমি আমাদের বাংলো, বাগান, গ্রীষ্মের আনন্দ সব ছেড়ে চলে যাব। বাবা আমার পাশেই ছিলেন, হাত ধরে আমায় ভেতরে নিয়ে এলেন।

ভেতরে আনের জামা, তার ফুল, তার সেন্ট সব ছড়ানো ছিল। বাবা জানালার পাখীগুলো টেনে দিয়ে আইস বাক্স থেকে একটা বোতল আর ছুটো গেলাস বের করে আন্‌লেন। তখনকার অবস্থায় এই একমাত্র ওষুধ। আমাদের চিঠিগুলো তখনও টেবিলের ওপর পড়েছিল, আমি হাত দিয়ে সেগুলোকে ফেলে দিলাম। উড়তে উড়তে মেঝেতে পড়ে গেল। বাবা গেলাস হাতে আমার দিকে এগোতে এগোতে থম্‌কে দাঁড়ালেন। তারপর সেগুলোর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন। গেলাসটা নিয়ে ঢক্‌ ঢক্‌ করে এক চুমুকেই সবটুকু খেয়ে নিলাম। ঘরটা আধো অন্ধকার করা ছিল। জানালার ওপর বাবার ছায়াটার দিকে নজর পড়ল। সমুদ্র তখনও ছন্দে ছন্দে তীরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফিরছিল।

১২

প্যারিসে শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হলো। সচরাচর যেমন হয়, এবারও তেমনি একদল কুতূহলী বন্ধুর সমাবেশ হ'ল। আনের বয়োঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। মন দিয়ে এদের আমি লক্ষ্য করে দেখলাম। মনে হ'ল যেন বছরে এক আধবার এরা আমাদের বাড়ি চায়ের নেমন্তনে আসতে পারতেন। সবাই করুণ চোখে বাবাকে লক্ষ্য করতে লাগল। ওয়েব ইতিমধ্যে বাবা আর আনের বিয়ের কথাটা রাষ্ট্র করে-ছিল। শ্রাদ্ধের শেষে সিরিল আমার দিকে তাকিয়ে ছিল— আমি কিন্তু এড়িয়ে গেলাম। ওর প্রতি আমার বিরূপ মনোভাবের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, তবু আমি নিজেকে দমন করতে পারলাম না। প্রত্যেকে এই নিদারুণ অর্থহীন অপঘাত মৃত্যুকে অভিশাপ দিচ্ছিল। আমার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল বলেই বোধহয় ওদের আলোচনায় শান্তি পেলাম।

বাড়ি ফেরার পথে বাবা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রইলেন। আমি ভেবে দেখলাম আবার আমরা দুজনকে নিয়ে থাকব শুধু। সঙ্গিহীন, শোকার্ত দুটি প্রাণী। এই প্রথম আমি কাঁদলাম। চোখের জলে মনের ভারটা খানিকটা নেবে গেল।

হাসপাতালে ভেনিসের ছবির সামনে একা বসে থাকার যে দুঃসহ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল—এ তার চেয়ে অনেক ভাল। বাবা নিঃশব্দে তাঁর রুমালখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাঁর মুখখানা শোকের যন্ত্রণায় বিকৃত। একমাস ধরে আমরা বিপত্নীক স্বামী আর অনাথা কন্যার মত কাটালাম। সর্বদা একসঙ্গে খাওয়া, থাকা, মাঝে মাঝে আনের কথাও উঠত—"মনে আছে সেই যেদিন"—আমরা ভয়ে ভয়ে কথা বলতাম, পাছে অজান্তে পরস্পরের মনে ঘা দিয়ে বসি। আমাদের চেষ্টাকৃত সংযম ও বিবেচনার সুফল ফল্‌ল। শিগ্‌গিরই আমরা আনের বিষয়ে অনেক সহজ হয়ে এলাম।

ভাবখানা এই, যেন আন্ নামক আমাদের অত্যন্ত প্রিয় কোন মেয়ের সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করার আশা করেছিলাম—ঈশ্বর তাকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। আমি অদৃষ্ট না বলে—ঈশ্বর বল্লাম, কিন্তু ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস ছিল না। এই জাতীয় ঘটনাকে আমরা অদৃষ্টের ফের বলেই মেনে নিতাম।

শেষে একদিন, এক বন্ধুর বাড়িতে আনের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাকে তার ভাল লেগে গেল, আমারও মন্দ লাগেনি। এক সপ্তাহ দুজনে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম, বাবা একা থাক্‌তে পারতেন না, শুধু সেইজন্যেই এক অতি আধুনিকার সঙ্গে বেড়াতে লাগ্‌লেন। জীবনের গতি পুরোন রাস্তায় ফিরে এল। তাইতো হয় সাধারণতঃ। ক্রমে ক্রমে আমাদের আলাপ

আলোচনাও সহজ হয়ে এল। নতুন করে কে কার প্রেমে পড়ল ইত্যাদি। বাবা জান্‌লেন যে এই ফিলিপের সংগে আমার সম্পর্ক বোনের মত নয়। আর আমিও বুঝলাম—তাঁর এই প্রণয়িনী বেশ কড়া হাতে তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে নিচ্ছে। তবুতো দুঃখ ভুললাম। শীত শেষ হয়ে আসছে। পুরোন সেই বাংলোয় আর আমরা ফিরে যাব না। 'জুয়ান-লে-পস্‌' এর কাছে আর একখানা বাংলো এবার ভাড়া করা হয়েছে।

শুধু ভোরবেলা যখন নীচে প্যারিসের রাস্তা থেকে মোটরের শব্দ আসে তখনই মন আমায় প্রতারণা করে। সেই গ্রীষ্মের ছুটি তার সমস্ত ঘটনাসম্ভার নিয়ে সাম্‌নে দাঁড়ায়। অন্ধকারে বার বার ডেকে উঠি—"আন্‌", "আন্‌"। আমার ভেতরে কে যেন জেগে উঠে চোখ বুঁজে নাম ধরে ডাক্‌তে থাকে। স্বাগত! বিষাদ!

—সমাপ্ত—